স ম্পূ র্ণ উ প ন্যা স

তুলসী

মতি নন্দী

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

এই কাহিনীতে বলা হয়েছে দুটি মানুষের কথা। তাঁদের একজন পুরুষ ও অন্যজন মেয়ে। পুরুষটির বয়স ষাটের কাছাকাছি, মেয়েটির বয়স প্রায় কুড়ি।

প্রথমে পুরুষটির কথা বলি। ওঁর দৈহিক উচ্চতা পাঁচ ফুট। দেহের পেশিগুলো একটু ভারী। ঘাড় ও গলা ছোট হওয়ায় তাঁকে ঘাড়েগর্দানে দেখায়। মনে হয় অল্প বয়সে ব্যায়াম করেছেন এবং হয়তো এখনও চর্চাটা রেখেছেন। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। চোখে পড়ার মতো বিশেষ কিছুই ওঁর চেহারায় নেই, শুধু উচ্চতাটুকু ছাড়া। তবে বেঁটেমানুষ আমাদের দেশে লক্ষ-লক্ষ আছে, সুতরাং এটা কোনও বিশেষত্ব হিসেবে গণ্য হতে পারে না। ওঁর যে মসৃণ টাকটি, সেটাও বহু লক্ষ লোকের মাথায় দেখা যায়। তবে মাথার খুলির গড়ন গোলাকার হওয়ায় টাকটি দু' নম্বর ফুটবলের কথা মনে পড়ায়।

এই লোকটির বিশেষত্ব বলে যদি কিছু থাকে তা হলে সেটি হল, ওঁর হাঁটা। হাঁটেন অতি দ্রুত। সাধারণ মানুষ জগ করে যে গতিতে, ইনি হাঁটেন সেই গতিতে। ওঁর উচ্চতার সঙ্গে হাঁটার বেগ, দুটো মিলিয়ে দাঁড়ায় একটা বেমানান দৃশ্য। যেটা হাসি পাইয়ে দেওয়ার জন্য খুবই কার্যকর হয়। যারা ওঁকে প্রথম দেখে,

তারা আড়ালে হাসাহাসি করে। তবে প্রতিদিন দেখে-দেখে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর তারা আর হাসে না।

কিন্তু বাজারের কাছের রামপ্রসাদ কলেজ হস্টেলের কোনও-কোনও ছেলের হাসির ইচ্ছেটা একটু বেশিই। সকালে বাজার করে থলি হাতে ফেরার সময় যখন তিনি হস্টেলের কাছাকাছি হন, তখন দোতলার বারান্দা থেকে ইদানীং কে একজন মাঝেমধ্যে সুর করে গেয়ে ওঠে :

মাথার উর্ধ্বে আছে মাদল
নিম্নে উতলা পদযুগল
গড়গড়িয়ে চলিছে বল।
চল চল চল ॥

শেষের 'চল চল চল'-এর সময় আরও দুটো গলা যোগ দেয়। গানের সঙ্গে টিনের কৌটোয় দুটো কাঠি দিয়ে ড্রাম বাজানোর শব্দ হয়। গায়ক ও বাদককে রাস্তা থেকে দেখা যায় না। আমাদের এই লোকটির নাম বলরাম গড়গড়ি। যেভাবেই হোক হস্টেলের ছেলেরা নামটা জোগাড় করে ফেলেছে।

প্রথমদিকে বলরাম গানটিকে আমলই দিতেন না। ছেলেপুলেরা নতুন কোনও গণসঙ্গীত চর্চা করছে ধরে নিয়ে আপন মনে তিনি হস্টেলের সামনে দিয়ে চলে যেতেন। একদিন তাঁর প্রতিবেশী পান্নালাল বাজার করে ফেরার সময় তাঁকে দাঁড় করিয়ে বলল, "শুনেছেন বলুদা, ছেলেরা কেমন পারডি বেঁধেছে আপনাকে নিয়ে।"

"আমাকে নিয়ে। কই, শুনিনি তো!" বলরাম খুব অবাক হয়েই বলেন, "কেন, কী জন্য?"

"শুনুন ভাল করে, তা হলেই বুঝবেন।" পান্নালাল মুখ টিপে হেসে চলে যায়।

বলরাম হস্টেলের দিকে মুখ তুলে তাকাতেই গানটা শুরু হয়ে গেল। দু'বার শোনার পর তিনি গম্ভীর হয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলেন। ঊর্ধ্বে মাথায় বাজা মাদলটি যে তাঁরই ঢাক, এবং গড়গড়িয়ে যাওয়া বলটি যে বলরাম গড়গড়ি, এটা বোঝার মতো বুদ্ধি তাঁর আছে। ক্লাস এইট পর্যন্ত বিদ্যের পানু অর্থাৎ পান্নালাল যখন বুঝতে পেরেছে, তখন তাঁর মতো বাংলায় অনার্স গ্র্যাজুয়েটের না বুঝতে পারার মতো কঠিন ব্যাপার তো এটা নয়। অনার্সে নজরুলের কবিতা তাঁকে পড়তে হয়েছে।

প্রথমেই বলরামের মাথা গরম হয়ে উঠল। ভাবলেন হস্টেলে ঢুকে ছেলেগুলোকে কান ধরে ওঠবোস করাবেন। তারপর মনে হল, এই বয়সে উঠতি জোয়ানদের কান ধরা তাঁর পক্ষে কি সম্ভব হবে? গায়ে ততটা জোর নিশ্চয়ই নেই। আগে নিজের শক্তি যাচাই করে তবেই কান ধরার মতো কাজে নামা উচিত।

কীভাবে গায়ের জোর যাচাই করা যায়? বলরাম খুবই ফাঁপরে পড়ে গেলেন। তিনি চাকরি করেন বিধাননগরে সরকারি অফিসে, বিদ্যানগর থেকে, যদি ঠিকমতো ট্রেন চলে তা হলে আধঘণ্টা ট্রেনে কাটিয়ে নামেন বিধাননগর স্টেশনে। সেখান থেকে বাসে অফিসে। তাঁর সহকর্মী মনোজ সামন্ত খুবই বিজ্ঞ লোক। বলরাম তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন, "সামন্ত, বলতে পারো, গায়ের জোর পরীক্ষার উপায় কী?"

মনোজ সামন্তর এরকম প্রশ্ন শুনে অবাক হওয়ারই কথা, কিন্তু তিনি হলেন না। শুধু বললেন, "কোনও ভারতশ্রী'র সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে বসুন।"

"তাতে তো হেরে যাব।" বলরামকে হতাশ দেখাল।

"তা তো হারবেনই, কিন্তু কতক্ষণে হারবেন সেটা দিয়ে পরিমাপ হবে আপনার গায়ে কতটা জোর রয়েছে।"

"ধরুন এক সেকেন্ডে হারলাম।"

"গড়পড়তা সবাই ওই এক সেকেন্ডেই হারবে। সুতরাং আপনার গায়ের জোরও ওই গড়পড়তা সবার মতোই ধরে নেবেন।"

"এটা তুমি কী বললে!" বলরাম অখুশি হলেন। "এইভাবে পাঞ্জা লড়ে কি শক্তি মাপা যায়?"

"তা হলে কীভাবে মাপতে চান? আর মাপতে চাওয়ার উদ্দেশ্যটাই বা কী?"

বলরাম একটু বিব্রত হলেন। উদ্দেশ্য তো ক'টা ছেলেকে কান ধরে ওঠবোস করানো। কিন্তু কেন করাতে চান, সেটা কি সামন্তকে বলা ঠিক হবে?

তবে ঘুরিয়ে অন্যভাবে অবশ্য ব্যাপারটা বলা যায়। এই ভেবে বলরাম বললেন, "আমাদের বিদ্যানগরে একটা কলেজ হস্টেল আছে, সেখানে কিছু অ্যান্টিসোশ্যাল ছেলে ঢুকেছে। ওদের জন্য লোকজন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারে না।"

"কেন পারে না?"

"নানারকম কথাবার্তা বলে, ফিল্মের গান গায়, রাস্তার মাঝে অসভ্যতা করে।"

"হস্টেল সুপারকে গিয়ে বলুন। তিনি কিছু না করলে থানায় গিয়ে বলুন।" মনোজ সামন্ত ঈষৎ বিরক্ত স্বরে বললেন, "আপনি কি এজন্য মারপিট করবেন?"

"মারপিট! কে বলল?" বলরাম সচকিত হয়ে উঠলেন।

"তা হলে গায়ের জোর পরীক্ষা করে দেখতে চান কেন? গড়গড়িদা সাবধান করে দিচ্ছি, খবরদার ছেলেছোকরাদের সঙ্গে লাগতে যাবেন না। একটা টিঙটিঙে ছোকরা দূর থেকে যদি বোমা ছোড়ে কি পাইপগান চালায় তা হলে কী করবেন? গায়ের জোরের দিন আর নেই, সুতরাং—" মনোজ সামন্ত একটা মোটা ফাইলের ফিতে খোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

বলরাম তাকিয়ে রইলেন সামন্তর দিকে। 'সুতরাং' বলে থেমে গেল কেন? আড়চোখে বলরামের মুখ দেখে নিয়ে সামন্ত আবার বললেন, "বুড়োবয়সে গায়ের জোর পরীক্ষা করে লাভ কী?"

"বুড়োবয়স মানে? আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি?" বলরাম অবাক হয়ে সামন্তকে যেন চ্যালেঞ্জ জানালেন।

চোখ কুঁচকে মনোজ সামন্ত সেকেন্ডদশেক বলরামের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর মুচকি হেসে বললেন, "না, বুড়ো হননি, ছোকরাই আছেন। বয়স কত হল?"

সেইদিন বিকেলে ট্রেন ধরার জন্য প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বলরামের মনে হল, সামন্ত বোধ হয় ঠিক কথাই বলেছে। বুড়োবয়সে কেউ কি গায়ের জোর পরীক্ষা করে? কিন্তু একটা কথা তাঁর মনে কাঁটার মতো খচখচ শুরু করল। বিদ্রূপ করেই অবশ্য সামন্ত বলল, 'ছোকরাই আছেন'— কিন্তু থাকব নাই-বা কেন?

এই 'থাকব নাই-বা কেন' কথাটা বলরামের মাথার মধ্যে এমনভাবে গেঁথে গেল যে, তিনি ট্রেনে উঠে মনে করতে শুরু করলেন তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে ছোকরা বয়সে কী-কী করতেন। তিনি ফুটবল-ক্রিকেট খেলেননি। কবাডিও নয়। কোনও দলগত খেলার দলে ঢুকতে পারতেন না শুধু এই দৈহিক উচ্চতার জন্য, তাই ওইসব খেলার দিকে যাননি। যে খেলা একা খেলা যায় এবং নিখরচায়, তিনি সেই খেলার দিকেই ঝোঁকেন।

তিনি গঙ্গায় সাঁতার কাটতেন। হাটখোলার তাঁদের ভাড়াবাড়ি থেকে আহিরিটোলা লঞ্চ ঘাট ছিল মিনিটতিনেকের পথ। সেখানে বেলা এগারোটা নাগাদ তাঁরা জনা সাত-আট ছেলে সাঁতার কাটতে যেতেন। ওপারে সালকিয়ার বাঁধাঘাটগামী ফেরি লঞ্চে উঠে মাঝগঙ্গা পর্যন্ত গিয়ে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়তেন জলে, সাঁতরে ফিরে আসতেন আহিরিটোলা ঘাটে। বলরাম পিছিয়ে পড়তেন না, কিন্তু সবার আগেও থাকতেন না। মাঝারি ধরনের সাঁতারু ছিলেন। পরপর তিন বছর তিনি বালি ব্রিজ থেকে আহিরিটোলা ঘাট পর্যন্ত সাঁতার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। শেষবারে দ্বিতীয়

স্থান পেয়েছিলেন একত্রিশজনের মধ্যে। যে কাপটা পান সেটা ছিল আসল রুপোর। ছোটকাকা স্যাকরার দোকানে দাম যাচাই করে এসে বলেছিলেন, "কম করে দেড়শো টাকা তো হবেই।"

কাপটা এখন আর নেই। বিদ্যানগরে জমি কিনে, কোনওরকমে একটা দু' ঘরের বাড়ি তৈরি করে হাটখোলা থেকে দশ বছর আগে উঠে আসার সময় কাপটা হারিয়ে যায়। ট্রেনের কামরায় গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে চিড়েচ্যাপটা অবস্থাতেই বলরাম তাঁর হারানো কাপের কথা ভাবলেন।

মুঠোয় ধরার জন্য ঝোলানো হাতলগুলোয় বলরামের হাত পৌঁছয় না। তাই তিনি চেষ্টা করেন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু সবদিন এই সুবিধেটা তিনি পান না, যেমন আজও পাননি। এক-একটা স্টেশন এলে হুড়মুড়িয়ে ট্রেনে ওঠার যাত্রীরা কামরার মধ্যে যে ধাক্কা তৈরি করে, তাতে বলরাম সিধে হয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। তখন শরীর বেঁকে যায় এবং বাঁকানো শরীরটাকে সিধে করার জন্য দু' পায়ে চাপ দিয়ে পিঠ, কোমর ও কাঁধের পেশি শক্ত করে নিজেকে নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে হয়। বলরামকে আজও তাই করতে হল। এবং এই করার মধ্যেই তাঁর মনে হল, এটা কি গায়ের জোরের একটা পরীক্ষা নয়? রোজই তো এই পরীক্ষাটা দিচ্ছি আর পাশও করছি, তা হলে কি এটাকে 'ছোকরা' থাকা বলা যেতে পারে না?

বিদ্যানগরের আগের স্টেশন ঠাকুরপাড়ায় ট্রেন পৌঁছবার আগেই বিদ্যানগরে নামার যাত্রীরা দরজার দিকে এগোতে থাকে। ট্রেন থামলেই হুড়মুড়িয়ে নামতে হবে, নয়তো দুড়দাড়িয়ে ওঠা বিপরীত স্রোতের বিরুদ্ধে ট্রেন থেকে নামাটা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে যায়। বলরাম আজ চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার কাজটা ভুলে গেলেন। যখন খেয়াল হল তখন কয়েক সেকেণ্ড দেরি হয়ে গেছে। মরিয়া হয়ে তিনি দরজা দিয়ে ঢোকা যাত্রী-স্রোতের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি শুরু করলেন। তখন কে যেন তাঁর মাথায় একটা চাঁটি দিল। ট্রেনের বাইরে সবে পা রাখতে যাবেন তখন কাঁধে একটা জোর ঠেলা খেয়ে প্ল্যাটফর্মে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গড়াগড়ি গেলেন। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াচ্ছেন তখন আর একটা ধাক্কায় আবার পড়োপড়ো হয়ে তিনি পেছন থেকে দু' হাতে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন যাকে, সে একটি মেয়ে।

হলুদ সালোয়ার ও খয়েরি-সবুজ নকশার কামিজ পরা মেয়েটি চমকে ঘুরে দাঁড়াল। একজন বয়স্ক লোককে কাঁচুমাচু হয়ে হাতজোড় করতে দেখে সে সঙ্গে-সঙ্গে মুখে হাসি ফুটিয়ে, বলরামকে আশ্বস্ত করে ভিড়ের সঙ্গে চলতে শুরু করে দিল। ট্রেন থেকে নামা লোকের প্ল্যাটফর্মে পড়ে যাওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার। কেউ ফিরে তাকায় না। কিন্তু বলরামের জীবনে এটা প্রথমবার ঘটল। তিনি লজ্জিতভাবে দু'পাশে তাকালেন এবং দেখলেন রামপ্রসাদ হস্টেলের দুটি ছেলে, তাদের হাতে ধরা প্লেটে ঘুগনি এবং তারা খাওয়া ভুলে তাঁর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। তাদের চাউনির মধ্য দিয়ে যে খবরটা বলরাম পড়তে পারলেন তাতে তাঁর বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল। হয়তো আবার শুরু হবে, 'গড়গড়িয়ে চলিছে বল।'

প্ল্যাটফর্মে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই 'ছোকরা থাকা'র পক্ষে যেসব যুক্তি খাড়া করেছিলেন সেগুলো তো চুরমার হয়েই গেছিল। এখন ছেলে দুটি ব্যাপারটাকে হস্টেলে কীভাবে চাউর করবে সেটাই বলরামকে অস্বস্তির মধ্যে রাখল।

প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে চার জোড়া রেললাইন পার হয়ে স্টেশনের পুবদিকে এসে বলরাম কলা কেনার জন্য দাঁড়ালেন। তখন দেখলেন সামনের 'মা তারা সাইকেল গ্যারেজ' থেকে সাইকেল নিয়ে সেই মেয়েটি বেরিয়ে এল। সাইকেলটি মেয়েদের জন্য নয়। কলাওলার পাশেই শশাওলা। মেয়েটি শশা কেনার

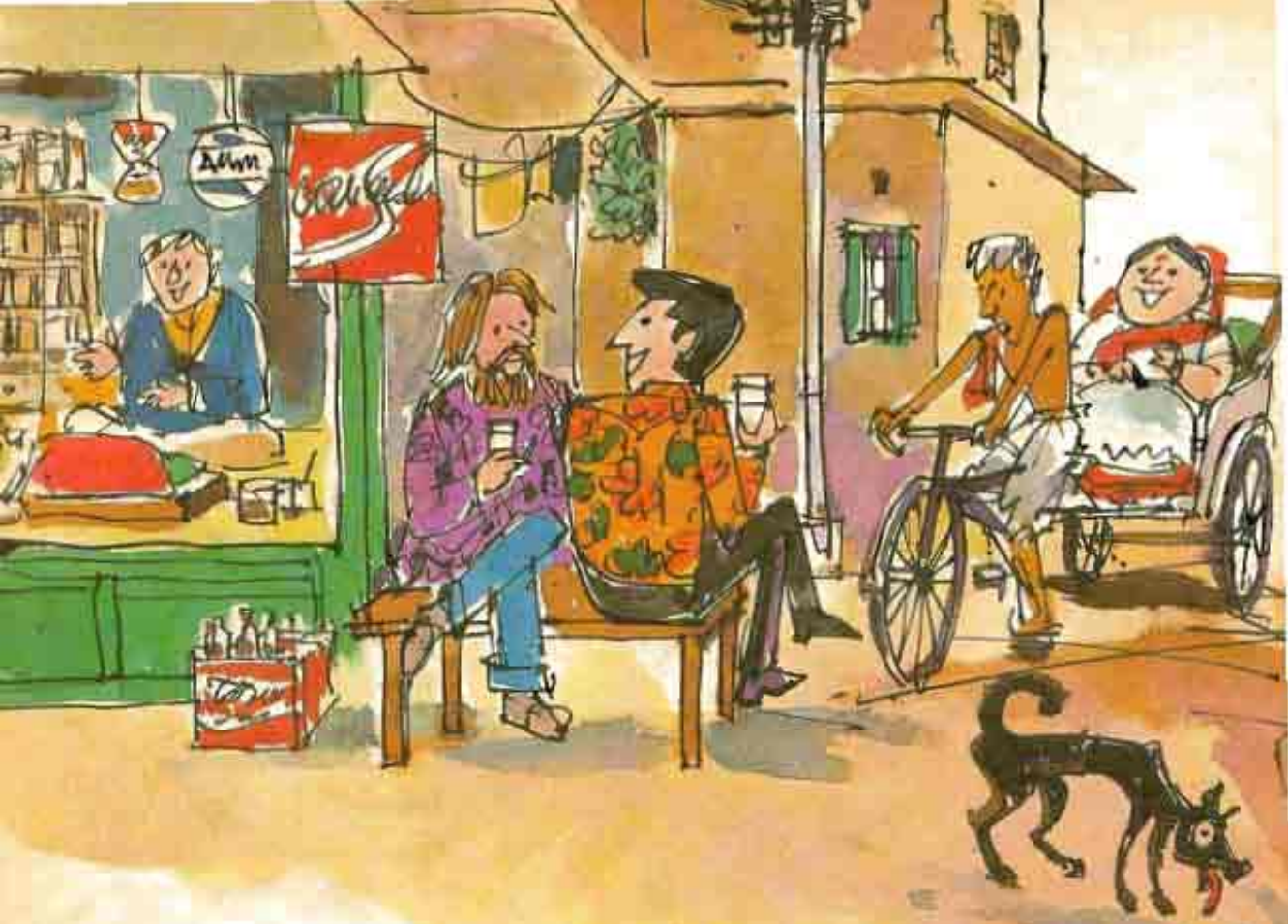

জন্য বলরামের পাশে দাঁড়াল এবং তাঁর দিকে তাকিয়ে সহানুভূতি জানাবার মতো করে হাসল।

"তুমি কিছু মনে করোনি তো, মা?" বলরামের স্বরে ক্ষমাপ্রার্থনার সুর।

তাঁর মনে হয়েছে মেয়েটি বিবেচক এবং বোধ বুদ্ধিটাও আছে। হালকা টাইপের নয়। সারা মুখ ক্লান্তিতে শুকনো, দুই গাল বসে গিয়েছে। ছিপছিপে, লম্বা, কিন্তু দৃঢ় শরীর। শরীর ঘিরে কঠিন জীবনের ছাপ। কোনও প্রসাধন নেই, গহনা বলতে শুধু কানে নকল দুটি সাদা পাথরের ফুল আর হাতে ফিট ওয়াচ। মেয়েটির রং, বোঝা যায় একসময় গৌরই ছিল, এখন রোদে পোড়া, তামাটে। ওর কপালে যে ব্যাগটা, দেখতে চামড়ার মতো হলেও ওটা কমদামি নকল চামড়ার। হাতে ধরা সাইকেলটা খুবই পুরনো, কেরিয়ারে পাকিয়ে রাখা আছে একটা বাজারের থলি।

কাহিনীর শুরুতে যে পুরুষ ও মেয়েটির কথা বলা হয়েছে সেই পুরুষটি বলরাম গড়গড়ি, আর মেয়েটি হল এখন তিনি যাকে বললেন, "কিছু মনে করোনি তো, মা?"

"না, না, এতে মনে করার কী আছে।" নম্র স্বরে সে আশ্বস্ত করল বলরামকে। "একজন মানুষ পড়ে যাচ্ছিলেন, তিনি অন্য একজন মানুষকে ধরে সেটা সামলালেন, এটাই তো স্বাভাবিক... ওই শশাটা, ওইটে, ওইটে, ছাড়িয়ে দিন।" শশাওলাকে নির্দেশ দিয়ে মেয়েটি মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে বলল, "মেসোমশাই, আপনি একটা খাবেন?"

"না, না, তুমি খাও। বড্ড পেট ভার করে। আমি এই সময় কিছু খাই না।"

"পেট ভরিয়ে রাখে বলেই তো খাই। বড্ড খিদে পায় এই সময়টায়।" বলেই মেয়েটি হেসে উঠল। বলরাম দেখলেন দাঁতগুলি ঝকঝকে কিন্তু অসমান, আর গলার স্বরটি সুমিষ্ট নয় অর্থাৎ কম মেয়েলি।

"আমি কলা কিনব, তুমি একটা খাবে?"

"খাব।"

সঙ্গে-সঙ্গে জবাব এল। বলরাম খুব খুশি হলেন। মেয়েটির মধ্যে ভান নেই। এমন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে তাঁর ভাল লাগে।

লম্বা চার ফালি করা খোসা ছাড়ানো শশাটায় নুন ঢুকিয়ে এক টুকরো কাগজে রেখে, লোকটি তুলে দিল মেয়েটির হাতে। একটা পঞ্চাশ পয়সা লোকটির হাতে দিয়ে সে একটা ফালি তুলে কামড় দিল এবং আড়চোখে কলা কেনায় ব্যস্ত বলরামের দিকে তাকাল।

বলরাম একছড়া কলা কিনে তার থেকে দুটি কলা ছিঁড়ে বাড়িয়ে ধরলেন। মেয়েটি তাড়াতাড়ি শশার টুকরো মুখে পুরে কলা দুটো নিয়ে বলল, "একটা দিলেই তো হত।"

"খিদে পেয়েছে বললে। এইটুকু কলা একটা খেয়ে কি কিছু হয়?"

চেইন খুলে ব্যাগের মধ্যে কলা দুটো রেখে মেয়েটি হাসল, "পরে খাব, আগে কাগজটা কিনে নিই।"

স্টেশন রোডের দু'ধারে সারি দিয়ে নানারকমের দোকান। সাইকেল রিকশা, অটো রিকশা আর শুধুই সাইকেল রাস্তাটাকে বিশৃঙ্খল করে রাখে। সেইসঙ্গে মানুষের ভিড়ে পথচলা দায়। বাজার কিছু দূরে। ওরা ভিড় ঠেলে হাঁটতে শুরু করল।

"কাগজ, মানে খবরের কাগজ?" বলরাম জানতে চাইলেন।

"হ্যাঁ।"

বলরাম বুঝলেন, সন্ধেবেলায় খবরের কাগজ কম দামে বিক্রি হয়, তাই সকালে না কিনে অনেকেই অফিস থেকে ফেরার পথে কেনে। এই মেয়েটিও তাই কেনে। কিন্তু খবরের স্টল তো তারা

ফেলে এসেছে, তা হলে যাচ্ছে কোথায় !

"তুমি এদিকে খবরের কাগজের দোকান তো পাবে না ?" বলরাম ভুল ধরিয়ে দেওয়ার মতো স্বরে বললেন।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল এবং হেসে ঠিক সামনেই পুরনো খবরের কাগজ ও শিশি-বোতলের দোকানটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

"আমি পুরনো কাগজ কিনব, ঠোঙা বানানো হবে।"

বলরাম মনে-মনে অপ্রতিভ হলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে সামলে উঠে বললেন, "ঠোঙা বানানোটা কুটিরশিল্প। তুমি নিজে বানাও ?"

"মা বানান। আমিও হাত লাগাই, মাঝে-মাঝে ছোট ভাইও বসে।" এর পর ইতস্তত করে বলল, "মেসোমশাই, সাইকেলটা একটু ধরবেন, আমি কাগজগুলো আনি।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

বলরাম সাইকেলটা ধরে দাঁড়ালেন। বোধ হয় আগেই বলা ছিল, ওজন করে পুরনো বাংলা খবরের কাগজ ডাঁই করে রাখা। সাইকেলের কেরিয়ারে যে বাজারের থলিটা ছিল সেটি আকারে যে কত বড়, বলরাম সেটা আগে বুঝতে পারেননি। এখন মেয়েটি দোকানির কাছে থলির মুখ খুলে ফাঁক করে ধরতে বলরাম সেটা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এ তো বাজারের ছোট থলি নয়, হাতে ধরে চাল বওয়ার জন্য অন্তত পনেরো কেজির থলি। তবে খবরের কাগজের পরিমাণ দেখে তাঁর মনে হল, পনেরো কেজির অনেক কমই হবে।

"মাস্টারমশাই, এখন আছেন কেমন ?" দোকানি জানতে চাইলেন মেয়েটির কাছে।

"সকালে তো জ্বর দেখে বেরিয়েছি। তবে পেটের যন্ত্রণাটা কমেনি।" মেয়েটি থলিটা মেঝে থেকে দু' হাতে তুলে ভেতরের কাগজগুলো ঝাঁকাল।

"ডাক্তারবাবু কী বলেন ?"

"কী আর বলবেন, সেই এক কথা... অপারেশন না করলে... আমি এখন আসি গোপালদা।"

"আয়।"

মেয়েটি এক হাতে থলিটা তুলে সাইকেলের কাছে এল। শরীরটা একটু বেঁকে, দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট টিপে ধরা।

"মেসোমশাই, সাইকেলটা একটু ধরবেন, এটা হাতলে ঝুলিয়ে দিই।"

"ওজন কত ?"

"দশ কেজি।"

"যাবে কদ্দুর ?"

"কুলডাঙা।"

"সেটা কোথায় ?"

"এই তো, মাজাডাঙা, তারপর হোতর, তারপর কুলডাঙা... মাইলচারেক।"

জবাব দিতে-দিতে সাইকেলের হাতলের বাঁকে থলিটা ঝুলিয়ে দিল।

"চাআর মাইল যাবে এই দশকেজি সাইকেলে ঝুলিয়ে !" বলরাম এবার যথেষ্ট অবাক হলেন।

মেয়েটিও অবাক এইরকম একটা কথা শুনে। "কেন, আমি তো কতবার কাগজ নিয়ে গেছি।" সাইকেল হাতে ধরে সে হাঁটতে শুরু করল, তার পাশে বলরাম। আরও কিছুটা গিয়ে ডান দিকের রাস্তায় তাঁর বাড়ি।

"রাস্তার অবস্থা যা ! গর্তে ভরা, দশগজ রাস্তাও সমান নয়, তার ওপর অন্ধকার। এই রাস্তায় হ্যান্ডেলে অত ওজন নিয়ে চালাতে গেলে তো পড়ে যাবে !" বলরামের উদ্বেগ তাঁর স্বরে ফুটে উঠল।

"এখনও তো পড়িনি।" হালকা স্বরে মেয়েটি বলল।

"কাজটা তো দাদা, কাকা বা বাড়ির কোনও পুরুষ করতে পারে, তুমি একটা মেয়ে—।" বলরাম চুপ করে গেলেন। তাঁর মনে হল একটু বেশিই যেন গায়েপড়া হয়ে যাচ্ছে।

"আমার দাদা নেই, আমিই বড়, কাকাও নেই, শুধু একটা বারো বছরের ভাই, স্কুলে পড়ে, বাবা স্কুলমাস্টার ছিলেন। তিন বছর রিটায়ার করেছেন, কিন্তু এখনও পেনশন পাননি। ওই যে গোপালদা বললাম যাঁকে, উনি বাবারই এক ছাত্র। কাগজের দাম নিলেন না। ঠোঙা তৈরি করে গোপালদাকে দিয়ে যাব। বিক্রি করে কাগজের দাম কেটে রেখে বাকিটা আমাকে দেবেন। বাবার আরও ছাত্র আছেন, নানাভাবে সাহায্য করেন।"

খবরের কাগজে প্রায়ই তো দেখি রিটায়ার করে শিক্ষকরা কেউ আট কেউ দশ বছর পেনশন পাচ্ছেন না।" বলরাম সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, "তোমার বাবা নিশ্চয় ভাল শিক্ষক ছিলেন, তাই ছাত্ররা সাহায্য করছে।"

"বাবা এখন ঘরভাড়া করে কোচিং খুলেছেন। স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়ান, তাতেই সংসার চলে। আগে কখনও করেননি, এখন করতে হচ্ছে বলে খুব কষ্ট পান।"

"তুমি করো কী?"

"কাজের চেষ্টা করছি। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ, চাইলেই কি চাকরি পাওয়া যায়? অনেককে বলে রেখেছি... মেসোমশাই আপনাকেও কিন্তু বলে রাখলাম।" মেয়েটির স্বরে এবার লঘুতার কোনও আভাস নেই।

"আমি খোঁজ পেলে তোমায় জানাব।" বলরামের গলায় আন্তরিকতা।

মেয়েটি এবার দাঁড়িয়ে পড়ল। আর দাঁড়াল ঠিক রামপ্রসাদ কলেজ হস্টেলের সামনেই। বলরাম মুখ না তুলেই দেখতে পেলেন দোতলার বারান্দায় গুটিতিনেক মুখ নীচের দিকে তাকিয়ে।

একহাত উঁচু কংক্রিটের একটা চাঙড়া বহুদিনই রাস্তার ধারে পড়ে আছে। মেয়েটি তার ওপর দাঁড়িয়ে সাইকেলের সিটে বসল। লাজুক হেসে বলল, "যখন কাগজ নিয়ে যাই তখন এইখানে এসে এইভাবেই উঠি। এমনি উঠতে গেলে ব্যালান্স রাখা যায় না, একবার পড়ে গেছলুম।... আসি তা হলে মেসোমশাই, খোঁজ পেলে বলবেন।"

বলরাম কিছু বলার আগেই মেয়েটি সাইকেল চালিয়ে দিল। প্রথম দশ-পনেরো মিটার টালমাটাল হয়ে সাইকেলটা সোজা হল এবং দূরের আলোবিহীন রাস্তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

থাকে কুলডাঙায় কিন্তু মেয়েটির নামটা তো জানা হল না! বলরাম নিজের বুদ্ধিহীনতায় নিজের ওপর বিরক্ত হলেন। যদি কোনও কাজের সন্ধান পান, অবশ্য না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তা হলে ওকে খবর দেবেন কী করে? একটা উপায় অবশ্য আছে, পুরনো কাগজের দোকানি গোপালকে বলে দিলে মেয়েটি খবর পেয়ে যাবে। বেশ ভাল মেয়ে, কত সহজে 'মেসোমশাই' ডাকল, ঠিক নিজের মেয়ের মতোই কথা বলল।

বলরাম আরও কিছুটা হেঁটে ডান দিকে বাড়ির পথ ধরার সময় মুখ ফিরিয়ে হস্টেলের বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখলেন মুখগুলো তাঁকে লক্ষ করছে।

বাড়ি ফিরে বলরাম তাঁর স্ত্রী বিমলাকে বললেন, "আজ একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। বড় ভাল মেয়ে। বয়স খুব কম, বলুর থেকেও ছোট। খুব পরিশ্রমী।"

বলু অর্থাৎ বলাই, তাঁদের একমাত্র সন্তান। বছর-দুই সে খড়্গপুর আই. আই. টি-তে ভূবিদ্যার ছাত্র। বলরাম-বিমলার সংসারে একটি কাজের মেয়ে ছাড়া আর কোনও লোক নেই। ট্রেনে নামার সময়ের ঘটনা থেকে শুরু করে দশ কেজি কাগজ হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে সাইকেল চালিয়ে কুলডাঙা রওনা হওয়া পর্যন্ত, মেয়েটির আচরণ ও কথাবার্তার সবকিছুর বিবরণ স্ত্রীকে দিলেন বলরাম। বিমলা সব শুনে জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়েটির নামটা তো বললে না?"

বলরাম মাথা অর্থাৎ টাক চুলকে বললেন, "ওটা জিজ্ঞেস করার সময় আর পাইনি।"

"সময় কখনওই তোমার হবে না।"

যে সময়ে বিমলা এই কথা বলছিলেন ঠিক তখনই কুলডাঙায় একতলা দু' ঘরের একটি বাড়ির সামনে মেয়েটি সাইকেল থেকে নামল।

"মা, দিদি এসেছে।" ভেতর থেকে একটি ছেলে চেঁচিয়ে তার মাকে জানিয়ে দিল।

ব্যস্ত হয়ে টালির চালার রান্নাঘর থেকে মা বেরিয়ে এলেন। "ওরে খুকি, জগন্নাথকাকা খবর পাঠিয়েছেন, আজই তোকে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।"

হ্যাণ্ডেল থেকে কাগজের থলিটা নামাবার জন্য সে ডাকল, "বাবু, এদিকে আয়।" তারপর ক্লান্ত স্বরে সে মাকে বলল, "কাল সকালে গেলে হয় না?"

"বলেছেন আজই দেখা করতে। ওঁর অপিসে বোধ হয় লোক নেবে।" মায়ের স্বরে ব্যস্ততা আর ক্ষীণ একটা আশা।

মেয়েটি থলিটা ভাইয়ের হাতে দিয়ে সাইকেলটা ঘোরাল। অন্ধকার রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে সে সাইকেলে উঠল। জগন্নাথ সেন কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে উচ্চপদে চাকুরে, তাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। থাকেন বিদ্যানগর স্টেশনের পশ্চিম দিকে।

এখন তাকে চার মাইল সাইকেল চালিয়ে আবার যেতে এবং ফিরতে হবে।

॥ ২ ॥

মেয়েটি যখন জগন্নাথ সেনের বাড়িতে পৌঁছল, তখন তিনি ছেলের বিয়ের ব্যাপারে ভাবী কুটুমদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সাইকেলটা বারান্দার ধারে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রেখে সে সিঁড়ি দিয়ে দু' ধাপ উঠে বারান্দা থেকে বসার ঘরে উঁকি দিল।

"কে? কে ওখানে?" ঘরের ভেতর থেকে জগন্নাথবাবু হাঁক পাড়লেন।

"আমি তুলসী।"

মেয়েটি কুণ্ঠিত পায়ে ঘরে ঢুকল। ঘরে সোফায় দুটি লোক, তাঁদের মুখোমুখি আর-একটি সোফায় জগন্নাথবাবু। মাঝে নিচু টেবলে দুটি প্লেটে কিছু মিষ্টি আর চা।

"ডেকেছিলেন, জগন্নাথকাকা?"

"হ্যাঁ। দিল্লি থেকে জেনারেল ম্যানেজারের কাছে একটা চিঠি এসেছে। আমরা এবার খেলার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে কিছু খেলোয়াড়কে চাকরি দেব।" জগন্নাথবাবু এর পর সামনের লোক দুটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিছু মনে করবেন না, আমি এর সঙ্গে একটু কথা বলে নি।"

"না, না, মনে করার কী আছে।" ওদের একজন ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন। "আপনি কথা বলে নিন।"

"আমাদের মিনিস্টার তো খেলাধুলো খুবই ভালবাসেন। গতবছর ফুটবল টিম আমরা করেছি, টেবল টেনিস আর ভলিবলেও টিম হয়েছে, কিন্তু সবই ছেলেদের। মিনিস্টার চান মেয়ে খেলোয়াড়দের চাকরি দিতে। বিদেশ থেকে সোনাটোনা তো ওরাই আনে।" জগন্নাথবাবু সামনের লোক দুটির দিকে তাকিয়ে শেষের কথাটি বললেন।

"পি. টি. উষা, সাইনি আব্রাহাম।" অপেক্ষাকৃত কমবয়সী লোকটি নাম দুটি মনে করিয়ে দিলেন।

"আমাদের ছেলেগুলো তো কোনও কম্মের নয় তাই স্পোর্টস

তবে ঠিক করেছে ছেলেদের বদলে এবার শুধু মেয়েদের চাকরি দেবে। বারোজনের কোটা ঠিক করে দিয়েছে ইস্টার্ন সার্কেলের জন্য। আমরা পেয়েছি পাঁচজনের চাকরির কোটা। দুটো ক্লাস থ্রি, তিনটে ক্লাস ফোর-এর চাকরি। কিন্তু পাঁচজন দিয়ে কোনও খেলার টিম তো আর করা যায় না। কাল আমাদের স্পোর্টস ক্লাবের মিটিংয়ে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আমি আবার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট।"

জগন্নাথবাবু সামনের দুই অতিথির দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসলেন। তাঁরা দু'জন খুব অবাক হলেন।

"আপনি স্পোর্টসেও আছেন। কই, এটা তো আমাদের বলেন নি?" বয়স্কজন বললেন ঈষৎ সমীহভরে।

"এ আর বলার মতো কথা নাকি! এককালে খেলতুম-টেলতুম, ফার্স্ট ডিভিশনে ফুটবল খেলেছি, ভলিটাও খারাপ খেলতুম না। তারপর যা হয়, চাকরিতে মন দিলুম, মাঠে যাওয়াও ছাড়লুম। এখন দেখছেন তো শরীরের অবস্থা।" জগন্নাথবাবু নিজের বিশাল ভুঁড়িটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তৃপ্তমুখে হাসলেন।

তুলসী হাসল না। সে ঠায় দাঁড়িয়েই আছে। জগন্নাথবাবু তাকে বসতে বলতে ভুলে গেছেন। তার নিজেরও কুণ্ঠা লাগছে খাবারের প্লেটের সামনে নিজের থেকে বসতে। তার মুখে শ্রান্তিমাখা উদ্বেগ। জগন্নাথবাবুর কথাগুলো থেকে সে এইটুকু বুঝেছে, পাঁচটা চাকরি ওঁর অফিসে পাঁচজন মেয়ে পাবে, কিন্তু তাদের খেলোয়াড় হতে হবে। কোন খেলার খেলোয়াড়দের জন্য চাকরিগুলো, সেটা এখনও জগন্নাথবাবু বলেননি। তবে স্বাভাবিক বুদ্ধিবিবেচনা থেকে সে ধরে নিয়েছে, রাজ্য পর্যায়ের খেলোয়াড় না হলে সরকারি চাকরি মেলে না।

"কাল মিটিংয়ে আমরা ঠিক করলাম, ওলিম্পিকে যেসব খেলা আছে তার মধ্যে থেকে ইনডিভিজুয়াল খেলার একটা-দুটো বেছে তাতেই চাকরি দেব। তুই আর্চারি কি রাইফেল শুটিং কি ব্যাডমিন্টন, এসব খেলা খেলেছিস? স্টেট মিটে চ্যাম্পিয়ান না হলেও অসুবিধে হবে না। সেকেন্ড, থার্ড পজিশন পেলেও আমরা স্পোর্টস বোর্ডে সুপারিশ করে বলব, ভবিষ্যতে এই মেয়েটির উন্নতি করার মতো সম্ভাবনা আছে। তুই এইসব খেলা—" জগন্নাথবাবু কথা অসমাপ্ত রেখে তুলসীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

চোখ নামিয়ে তুলসী শুনে যাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছে, কী এক অবাস্তব জগতে তার এই জগন্নাথকাকা বাস করছেন! কুলডাঙার মতো জায়গায় বাস করে যে মেয়ে সে তীরধনুক, রাইফেল, ব্যাডমিন্টন পাবে কী করে? সে শুনেছে মাত্র এইসব খেলার কথা, পাশের বাড়ির টিভি-তে মাত্র একবার দেখেছে। শুনেছে হাজার-হাজার টাকা লাগে একটা ধনুক বা রাইফেল কিনতে। ব্যাডমিন্টন খেলার কোনও ব্যবস্থাই নেই তাদের দশ বর্গ মাইলের মধ্যে।

"না কাকা, আমি এসব খেলা কখনও খেলিনি।"

"তাই তো।" জগন্নাথবাবু হতাশ হয়ে যেন ঝিমিয়ে পড়লেন। "তা হলে আর কী খেলা জানিস?"

"সাঁতার জানি, সাইক্লিং জানি তবে কম্পিটিশনে কখনও নামিনি।" তুলসী আশাভরে তাকাল। কিন্তু জগন্নাথবাবুর মুখের ভাব বদলাল না দেখে সে দমে গেল।

"আমাদের অল ইন্ডিয়া ইন্টার সার্কেল স্পোর্টসে যে-যে বিষয়ে কম্পিটিশন হয় শুধু সেই খেলাগুলোতেই প্লেয়ার নিয়ে থাকি। তার মধ্যে মেয়েদের সাইক্লিং নেই, সাঁতার অবশ্য আছে। কিন্তু সুইমার নিতে হলে তো আমরা নামী সুইমারই নেব।"

"নামী মানে, কীরকম নামী?" তুলসী জানতে চাইল।

"নামী মানে রেকর্ড-টেকর্ড করেছে, ন্যাশনালে গোল্ড কি সিলভার পেয়েছে।"

তুলসী অপ্রতিভ হয়ে মাথা নাড়ল। সে বুঝতে পারছে জগন্নাথকাকা যা চাইছেন তা পূরণ করা তার দ্বারা সম্ভব নয়। তবু মরিয়া হয়ে বলল, "অ্যাথলেটিক্সে তো নিতে পারেন।"

জগন্নাথ কিছুক্ষণ তুলসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, "অ্যাথলেটিক্স অবশ্য ইনডিভিজুয়াল ব্যাপার, এতে আমরা মেয়ে নিতে পারি। তুই কম্পিটিশনে নেমেছিস কখনও? স্ট্যাণ্ড করেছিস?" এর পর তিনি অতিথি দুজনের প্রতি মনোযোগ করলেন। "এ কী, আপনারা এখনও শুরু করেননি? আমাদের এখানকার ক্ষীরের চমচম খুব বিখ্যাত, শুরু করুন।"

তুলসী স্কুলে পড়ার সময় বাৎসরিক স্পোর্টসে নেমে পরপর চারবছর প্রথম হয়েছে একশো, দুশো, চারশো মিটারে। স্পোর্টসের দিন দশেক আগে, মাইলখানেক দূরের হোস্টেলের ফুটবল মাঠে সে কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করে নিত। আর তাতেই প্রথম হয়ে যেত। সে এটুকু অন্তত বোঝে, স্কুলের স্পোর্টসের রেজাল্ট দেখিয়ে এইসব চাকরি চাওয়া যায় না।

কিন্তু এখন সে মরিয়া একটা চাকরি পাওয়ার জন্য। তাই একটা মিথ্যা কথা বলে ভাগ্যপরীক্ষা করতেও রাজি। সূর্য সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রতি বছর দৌড়ের রোড রেস হয়। মেয়ে-পুরুষ তাতে দৌড়ায়। পথের ধারে ভিড় করে লোকে দেখে, তুলসীও দেখেছে কিন্তু দৌড়ে কখনও নামেনি। কিন্তু এখন সে বলল, "পাঁচ মাইল রোড রেসে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছি।"

"আমাদের ইন্টার সার্কেলে রোড রেস হয় না, আর যা হয় না তাতে চাকরি দিই না। তবে মেয়েদের পাঁচ হাজার কি দশ হাজার কিলোমিটার দৌড় হয় কি না বলতে পারছি না। খোঁজ নিয়ে দেখি, যদি হয় তোকে খবর দেব। তবে দৌড়ের থেকে ফিল্ড ইভেন্টে, মানে জাম্পিং-এ, থ্রোয়িং-এ পয়েন্ট পাওয়ার চান্স বেশি। তাই, নিলে, এইসবেতেই আমরা মেয়ে নেব। তুই ডিসকাসে কি শটপাটে কোনও মিট-এ নেমেছিস?"

ফাঁপরে পড়ল তুলসী। কোনওটাতেই সে জীবনে নামেনি। ট্রেন যেতে-যেতে ঠাকুরপাড়া স্টেশনের পাশের মাঠে সে কয়েকটি ছেলে আর মেয়েকে দৌড়, লং জাম্প, ডিসকাস প্র্যাকটিস করতে দেখেছে। ওখানে যুব সংঘেরনী নামে অ্যাথলেটিক্সের একটা ক্লাব আছে। একদিন সে একটি মেয়েকে একটা নারকেলের সাইজের লোহার বল ছুড়তে দেখেছে। এই ছোড়াকেই বলা হয় শটপাট। তার মনে হয়েছিল গায়ে জোর না থাকলে লোহার বল ছোড়া যায় না এবং ছবিতে দেখেছে যেসব মেয়ে ছোড়ে তাদের আগড়াই ভারী চেহারা, অথচ সে ছিপছিপে, হালকা। সুতরাং সে শটপাটার এ-কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। তা ছাড়া চাকরি দেওয়ার আগে সার্টিফিকেট তো অবশ্যই দেখতে চাইবে। তখন সে কী দেখাবে?

তুলসী মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল, সে ডিসকাসে বা শটপাটে নামেনি। "কিন্তু কাকাবাবু, আমি যদি শিখে নিতে পারি?"

এবার ঘরের তিনজনেই বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকালেন। বলে কী মেয়েটা! লোহার গোলাটাকে কি হাতের মোয়া বা ডিসকাসের চাকতিটাকে কি গুড়ের পাটালি ভেবেছে নাকি? শিখে নেব বললেই কি শেখা যায়? বছরের পর বছর প্র্যাকটিস তা হলে করার হয় কেন?

জগন্নাথবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "তুই এখন যা, এঁদের সঙ্গে একটু কথা বলব। কিছু হলে তোকে খবর পাঠাব।"

ঘর থেকে বেরিয়ে সাইকেল হাতে ধরে রাস্তায় আসার সময় সে ভাবল, জগন্নাথকাকা গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন? 'শিখে নিতে পারি' শুনে ধরে নিয়েছেন নিশ্চয় মাথায় গোলমাল আছে। সত্যিই হয়তো আছে, নইলে এমন একটা অবাস্তব কথা তার মুখ দিয়ে বেরোবে কেন!

সাইকেলে চড়ে সে বিদ্যানগর স্টেশনে পৌঁছে সাইকেল থেকে লেভেল ক্রসিংয়ে নামল রেললাইনগুলো পার হওয়ার জন্য। ট্রেন আসছে তাই গেটটা বন্ধ। কিন্তু ধৈর্য হারানো কিছু সাইকেল হাতে ধরে নিচু হয়ে আড়াআড়ি থাকা কাঠের খুঁটির তলা দিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। তুলসীও তাই করল।

ডাউন দু' নম্বর রেলের ট্র্যাকে লোকাল ট্রেনের ঘটার শোনা গেল। তুলসী সাইকেল দু' হাতে ধরে উঁচু লাইনগুলো আর পাথরকুচির ওপর দিয়ে ছুট দিল। আপ এক নম্বর ট্র্যাক পেরিয়েছে। দু' নম্বরটা পার হয়েই একটা গর্ত। বহুদিন ধরেই রয়েছে এই গর্তটা। কিন্তু লম্বা-লম্বা ঘাসে আর ফলওয়ালাদের ফেলে দেওয়া ফলের পাতায় ঢেকে থাকায় বোঝা যায় না ওখানে একটা বড় গর্ত রয়েছে। যারা নিয়মিত যাতায়াত করে তারা জায়গাটাকে চেনে, তাই এড়িয়ে যায়। তুলসীও গর্তটাকে জানে। কিন্তু এখন ট্রেনটাকে সামলাতে গিয়ে তার সরে যাওয়ার মতো সময় ছিল না। গর্তে পড়ল সাইকেলের সামনের চাকা। সেটা টেনে তুলে তিন নম্বর ট্র্যাকে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে ট্রেনটা ঢুকল বিদ্যানগর স্টেশনে।

কিছু লোক যারা তুলসীকে এইভাবে লাইন পার হতে দেখল, তারা তার দিকে ভর্ৎসনা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে। একজন বলল, "একটু কি ধৈর্য ধরতে পারো না?"

আর একজন বলল, "এখন মানুষের যেন আর তর সয় না, আধ মিনিটও সবুর করতে পারে না। এত ব্যস্ততা কিসের?"

তুলসী মাথা নামিয়ে কথাগুলো শুনতে-শুনতে চার নম্বর ট্র্যাক পেরিয়ে স্টেশন রোডে এল। তার মনে হল, সত্যিই তার ধৈর্যটা কম। কিন্তু এই লোকগুলো কি জানে, এখনই তার একটা চাকরি দরকার। আলসারে বাবা ধুঁকছেন, আর তিনি সংসার টানতে পারছেন না। তেরো বছরের ক্লাস সেভেনে পড়া ভাই ট্রেনে চিনেবাদাম ফেরি করার কাজ নেবে বলছে। হ্যাঁ, সে খুবই ব্যস্ত।

সাইকেলে উঠল তুলসী। জলতেষ্টা পেয়েছে। খিদেটা এখন হুহু করে বাড়ছে। এখানে ধারেকাছে টিউবওয়েল নেই। শশাটাও যে কখন হজম হয়ে গেছে! আর সেই টাকওলা ভদ্রলোক বললেন কি না 'বড্ড পেট ভার করে'। এখন তো লোহা খেয়ে সে হজম করে ফেলতে পারে। এত খিদে—

আর ঠিক এই সময়ই সাইকেলের সামনের চাকার টিউব পাংচার হয়ে চাকাটা বসে গেল। ব্রেক কষে তুলসী সাইকেল থেকে নামল। টায়ারটা আঙুল দিয়ে টিপে সে মাথা নাড়ল। দু' মাস আগে একবার সে এই অবস্থায় পড়েছিল। তবু রক্ষে, পাংচারটা হয়েছিল বাড়ির কাছেই। কিন্তু এখন?

তার কাছে একটা পাঁচ পয়সাও নেই। টিউবটা সারিয়ে নিতে হলে তাকে ধার রাখতে হবে। বিপদের কথা বলে ধরাধরি করলে, 'জটাধারী সাইকেল রিপেয়ারিং শপ'-এর বুড়ো মালিক জটাধারী হালদার হয়তো দয়া দেখাতে পারে। এই ভেবে তুলসী আবার ফিরে এল স্টেশনের দিকে।

হায় কপাল! দোকানটা যে বন্ধ। তুলসী ফ্যালফ্যাল করে বন্ধ ঝাঁপের দিকে তাকিয়ে রইল। সেই সময় পাশের রেডিমেড পোশাকের দোকানের মালিক বলল, "আজ দু'দিন হল জটুদার দোকান বন্ধ। বোধ হয় অসুখবিসুখ করেছে।"

এবার তা হলে সাইকেল হাতে ধরে চারমাইল হেঁটে কুলডাঙায় ফিরে যাওয়া! আজ সারাদিন একটা কাজও তার সফল হল না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিল "বাড়ি-বাড়ি ঘুরিয়া প্রসাধনসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য কয়েকজন সেলসগার্ল আবশ্যক। সত্বর দেখা করুন।" এবং সে আজ কলকাতায় দেখা করতে গিয়ে শুনল, "পাঁচজন মেয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। পরে আবার নেওয়া হতে পারে। মাঝে-মাঝে এসে খবর নেবেন।" তারপর জগন্নাথকাকার কাছ থেকেও হতাশ হয়ে ফিরে আসা। এমন সব

খেলার জন্য চাকরি, যার একটাও সে খেলেনি। কবাডি, খো খো সে ভালই খেলে। এক বছর সে সূর্য সঙ্ঘের হয়ে কলকাতায় কবাডি লিগে খেলেছে। একবার তার মনে হয়েছিল জগন্নাথকাকাকে বলে "আপনারা মেয়েদের কবাডি টিম করুন না!" কিন্তু উনি যখন বললেন মাত্র পাঁচজনকে চাকরি দেওয়ার কোটা পেয়েছেন, তখনই সে মনে-মনে চুপসে যায়। একটা কবাডি টিম করতে কমপক্ষে বারোজন প্লেয়ার চাই। সাতজন খেলে, পাঁচজন রিজার্ভে থাকে।

সাইকেল হাতে ধরে স্টেশন রোড দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে তুলসীর আর-একটা কথা মনে হওয়ায় তার সারাদিনের ব্যর্থতার কষ্টটা যেন আরও বেড়ে গেল। সে একটা মিথ্যা কথা বলেছে। পাঁচ মাইল দৌড়ে সে কখনও নামেনি। অথচ চাকরি পাওয়ার আশায় সে জগন্নাথকাকাকে বলে দিল, মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। একেই কি বলে 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'? ছি ছি ছি, তুলসী মাথা নাড়ল। বাবা, মা, কি ছোটভাইটা শুনলে তার সম্পর্কে কী ভাববে?

লোকটা ঠিকই বলেছে, "এত ব্যস্ততা কিসের?" আর এই জন্যই তো সে বোকার মতো বলে বসল, "আমি যদি শিখে নিতে পারি?" গাছে না উঠতেই এককাঁদি! খেলাধুলোয় ওপরদিকে উঠতে গেলে কত ধৈর্যের আর খাটুনির দরকার। আর সে কিনা বলে বসল—। তুলসী মাথা নাড়ল। লোকটা ঠিকই বলেছে, "একটু কি ধৈর্য ধরতে পারো না?" পি. টি. উষা, সাইনি আব্রাহাম কত বছর পরিশ্রম করেছে বলেই না ওপরে উঠেছে। আর আমি, কুলডাঙার তুলসী রায়, আমি কিনা দু'দিনেই শটপাট, ডিসকাস শিখে নিয়ে চাকরি পাব আশা করছি!

স্টেশন রোড শেষ হয়ে গেল। এবার রাস্তায় আর আলো নেই। মাজাভাঙা, হোতর, কুলডাঙা। সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে তুলসী তাকাল। আজ সে মোট বারো মাইল সাইকেল চালিয়েছে। পেটে আগুন জ্বলছে। এখনও চার মাইল তাকে হাঁটতে হবে।

ঠিক আছে। তুলসী হাঁটা শুরু করল।

॥ ৩ ॥

সকালে বাজার থেকে ফিরছেন বলরাম। হস্টেলের কাছাকাছি হতেই শুরু হল অদৃশ্য গায়কদের কোরাস:

ট্রেনের এই খোলা কপাট,
নামে লোক ঝপাত ঝপাত
চিত পটাত
প্ল্যাটফরমের পায়াণ পরে॥

বলরাম থমকে দাঁড়ালেন। হঠাৎ তাঁর দেহের সব রক্ত যেন মাথার দিকে উঠতে শুরু করল, ফলে মাথাটা গরম হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত ঘষে অস্ফুটে বললেন, "অসভ্যতা এবার বন্ধ করা দরকার। দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে।"

চশমাপরা একটি মুখ মুহূর্তের জন্য বারান্দায় উঁকি দিয়েই সরে গেল। তারপরই আবার শুরু হল:

ওরে ও তরুণ বুড়ো,
গড়াগড়ি দিসনে ওরে
লক্ষ মারো
উঠবে রে চুল টাক উপরে॥

'টাক উপরে' যখন শেষ হচ্ছে, বলরাম তখন বাজারের থলি হাতে সিঁড়ি দিয়ে দোতলার বারান্দায় উঠে এসেছেন। দুটি ছেলে রাস্তার দিকে মুখ করে গেয়ে চলেছে। মেঝেয় বসে একজন দুটো কাঠি দিয়ে কম্পিত একটা গোল টিনে ড্রাম বাজাচ্ছে।

"পাজি, হতভাগা, নচ্ছার।" চিৎকার করে উঠে বলরাম থলিটা নামিয়ে রেখে চড় কষালেন চশমাপরা, ফরসা, টিঙটিঙে রোগা ছেলেটির গালে।

চশমাটা ছিটকে পড়ামাত্র একটা কাচ ভেঙে গেল। এর পর দ্বিতীয়টির গেঞ্জি ধরে এমন টান দিলেন যে, সে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং গেঞ্জি ছিঁড়ে গেল। ড্রামবাদক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বলরাম টিনের কৌটোয় জোরে লাথি মারতেই সেটা দেওয়ালে গিয়ে লাগল।

হতভম্ব অবস্থাটা কাটিয়ে উঠে ওরা তিনজন একসঙ্গে চেঁচাতে শুরু করল। বলরামের মুখে শুধু একটাই কথা, "দাঁড়া, আজ তোদের মজা বার করছি। ...ওরে ও তরুণ বুড়ো? ....দ্যাখ তবে বুড়োটা কে?"

বলতে-বলতে বলরাম দু' হাতে অন্ধের মতো ঘুসি ছুড়তে লাগলেন, যার একটাও কিন্তু লাফিয়ে-লাফিয়ে সরে যাওয়া ওদের গায়ে লাগল না। এর মধ্যেই ড্রামবাদক, যে রীতিমতো বলিষ্ঠ এবং চটপটে, বলরামকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে ল্যাং-মেরে মেঝেয় ফেলে দিল। বাকি দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর।

গোলমালের আওয়াজে হস্টেলের অন্যান্য ছাত্ররা ছুটে এসেছে। কাচভাঙা চশমাটা হাতে নিয়ে টিঙটিঙে যুবক তখন চিৎকার করে যাচ্ছে, "বাঁচাও, বাঁচাও। আমরা আক্রান্ত।" উপুড় হয়ে পড়া বলরামের পিঠের ওপর চেপে বসে, ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে ছেলেটি দু' হাতে তাঁর মাথায় চাঁটি মেরে চলেছে আর টিনের ড্রাম বাজাতে-বাজাতে অন্যজন গেয়ে যাচ্ছে, "মাথার উর্ধ্বে আছে মাদল, নিম্নে উতলা পদযুগল, গড়গড়িয়ে চলিছে বল, চল চল চল।"

ব্যাপারটা যদিও বিদঘুটে হাস্যকর, কিন্তু বলরামের কাছে সেটা মর্মান্তিক। হস্টেলের বয়স্ক ছাত্ররা এমন একটা দৃশ্য দেখে প্রথমে থতমত খেয়ে যায়। তারপর ছুটে গিয়ে একজন বলরামের পিঠের ওপর থেকে ড্রামবাদককে টেনে নামাল।

"হচ্ছে কী? একজন বুড়ো লোককে এইভাবে হেনস্থা করা?"

"এই বুড়ো লোক আমাদের কী করেছে, অনিলদা তুমি কি সেটা দেখেছ? তুমি শুধু ওকে হেনস্থা করাটাই দেখলে। হেনস্থা নয়, এটা হল আত্মরক্ষা।" ড্রামবাদক বাজনা থামিয়ে কথাটা বলেই আবার তার বাদন শুরু করল।

"উঠে আয়, ওঠ ওঠ।" অনিলদা নামের ছাত্রটি বলরামের পিঠ থেকে টেনে তুলল ছেঁড়া গেঞ্জিপরা ছেলেটিকে।

বলরাম উপুড় হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তিনি কিছুই ভাবছেন না। মাথার মধ্যে শুধু অন্ধকার আর ঝোড়ো বাতাসের মতো শোঁ শোঁ শব্দ। প্রচণ্ড রাগে জ্বলে ওঠার বদলে এখন তিনি গভীর লজ্জায় ডুবে যাচ্ছেন। 'কেন, কেন, এমন একটা বোকামি করতে গেলাম?' এই কথাটাই এখন তাঁকে ছোবলাতে শুরু করেছে।

তিনি ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। কপালে, নাকে ধুলো লেগে। বাহু তুলে পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে ধুলো মুছলেন। বারান্দার এককোণে বাজারের থলিটা কাত হয়ে রয়েছে। দুটো পেঁয়াজ মেঝেয় পড়ে। বলরাম নিচু হয়ে পেঁয়াজ দুটো তুলে থলির মধ্যে রেখে, মাথা নিচু করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

এতক্ষণ ওরা কেউ নড়েনি, শুধু চুপচাপ দেখে যাচ্ছিল। বলরাম নীচে নেমে যেতেই ওরা বারান্দার পাঁচিলে এসে নীচের দিকে তাকাল। থলি হাতে পাঁচ ফুট এক ইঞ্চির একটি মানুষ মাথা নামিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, হাঁটছেন ধীরগতিতে। কী যেন তিনি ভাবছেন।

"আর যদি একবারও তোরা গান ধরিস তা হলে এই রামপ্রসাদ হস্টেল তোদের আর—।"

"অনিলদা, আমরা তো ওঁর নাম করে গান—"

"চঅঅপ।" বিশাল একটা দাবড়ানিতে, ওরা তিনজন নিয়ে গেল।

"তিনটে ছোকরা মিলে একজন বুড়ো মানুষকে মারছিস, লজ্জা করে না? তোরা কি ইয়াম্যান? উনি কী অন্যায় করেছেন তা আমার জানার দরকার নেই। আমি শুধু দেখলাম তিনটে অল্পবয়সী ছেলে একজন বুড়ো মানুষের গায়ে হাত তুলেছে। উনি বিনা দোষে যদি মারেনও, দাঁড়িয়ে মার খাবি, তাতে লজ্জার কিছু নেই। গায়ে জোর থাকলেই ইয়াং হয় না, বুঝলি, ম্যান বলেও একটা কথা আছে। আগে 'ম্যান' হওয়ার চেষ্টা কর..... এই বলে রাখলাম, হস্টেলের বদনাম হয় এমন কাজ আর যেন না ঘটে।"

অনিল ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় জলন্ত চোখে তিনজনের দিকে তাকিয়ে গেল।

বলরাম বাড়ি ফেরার পথে ভাবছিলেন, সত্যিই তিনি বোধ হয় বুড়ো হয়ে গেছেন। তাঁর ধৈর্যশক্তি কমে গেছে, সহিষ্ণুতা লোপ পেয়েছে। তা না হলে এমন করে রেগে উঠবেন কেন? ওরা প্যারডি বেঁধেছে তো কী হয়েছে? মজা করতে চেয়েছে তো মজা করুক। ওদের সঙ্গে আমারও তো মজা পাওয়া উচিত ছিল। ভগবান আমাকে এমনই একটা চেহারা দিয়েছেন, এতে আমার তো কোনও হাত নেই। হাঁটাটা অবশ্য আমার নিজস্ব। এটা বদলাবার চেষ্টা করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা করিনি। লোকে আমার হাঁটা দেখে হাসে। হাসবেই তো। যা ঘটে গেল, নিশ্চয় এটা জানাজানি হয়ে যাবে। রসিয়ে-রসিয়ে লোকে বলাবলি করবে আর হাসবে। ইস্‌স...।

বলরামের চোখে জল এসে গেল। পাঞ্জাবির হাতায় চোখ ঘষলেন। আর ধীরে-ধীরে তখন তাঁর মনের মধ্যে একটা লোহার মতো কঠিন ইচ্ছা দানা বাঁধতে শুরু করল। বাড়িতে ঢোকার আগে সদর দরজায় কয়েক সেকেন্ড দাঁড়ালেন। ফিসফিস করে নিজেকে শুনিয়ে তিনি বললেন, "আমাকে বুড়ো না হওয়ার পরীক্ষা দিতে হবে।"

॥ ৪ ॥

"মেসোমশাই, মেসোমশাই।"

চিৎকার করে হাতছানি দিচ্ছে তুলসী। বলরাম থমকে দাঁড়ালেন। গোপালের কাগজের দোকানে উবু হয়ে বসে সেই মেয়েটি। মেঝেয় দড়ি দিয়ে দিস্তা করে বাঁধা ঠোঙার স্তূপ।

"অফিসে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

তুলসী বেরিয়ে এল দোকান থেকে। "মনে আছে আমি যা বলেছিলাম?"

বলরাম ভাবতে শুরু করলেন।

"চাকরির কোনও সন্ধান পেলে আমাকে জানাবেন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে আমার।" বলরাম অপ্রতিভতা কাটাতে একটু জোর দিয়েই বললেন, "নিশ্চয় খবর দেব তোমায়। কিন্তু তোমার নামটা তো জানা হয়নি এখনও। কুলডাঙায় থাকো, শুধু এটাই জানি।"

"আমার নাম তুলসী রায়। কুলডাঙায় রমেনসারের বাড়ি বললে যে কেউই দেখিয়ে দেবে। তা ছাড়া আপনি গোপালদাকেও বলতে পারেন, আমি রোজই তো এখান দিয়ে যাই।"

"ঠিক আছে, আমি এখানেই বলব।" বলরাম স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন এবং তাঁর আগের গতিতে নয়। তুলসীও তাঁর সঙ্গে চলেছে।

"তোমার সাইকেলটা কই?"

"সেটাই তো আনতে যাচ্ছি। আর বলবেন না, সেদিন রাতে বাড়ি ফিরেই আবার আসতে হয়েছিল স্টেশনের ওপারে আমার এক দূরসম্পর্কের কাকার বাড়িতে, ওই চাকরির খোঁজেই। কথা বলে বুঝলাম, হবে না। ওরা গেলোয়াড় মেয়ে চায়।"

"কী খেলার?"

"আচারি, রাইফেল শুটিং, শটপাট... এইসব। আমি তো এর কোনওটাই জানি না। সাইকেল চালাতে পারি, দৌড়তে পারি, আমাদের গ্রামের সরকারি ফিশারিজ ডিপার্টমেন্টের বিরাট একটা দিঘি আছে, রানিসায়ের নাম, সেখানে প্রায়ই যাই। ঘণ্টাখানেক সাঁতার কাটি। কিন্তু সেই সাঁতারের কথা বলে চাকরি তো আর চাওয়া যায় না।"

"আমিও সাঁতার কাটতাম। কলকাতায় আমাদের বাড়ির কাছেই গঙ্গা। স্কুলের গরমের ছুটি পড়লে, গঙ্গাতেই ঘণ্টা দুয়েক রোজ পড়ে থাকতাম। গঙ্গায় একটা কম্পিটিশনে একবার কাপও জিতেছি, সেকেন্ড হয়েছিলাম।" বলরাম বাধো-বাধো স্বরে খবরটা জানালেন।

তুলসী মুখ ফিরিয়ে চোখ কুঁচকে তাঁকে দেখল। বলরামের মনে হল, মেয়েটি বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারছে না। তিনি মুখ গম্ভীর করে বললেন, "তোমাদের রানিসায়রে গিয়ে সাঁতার কাটা যাবে?"

"কেন কাটা যাবে না। আসুন না আপনি।"

"ভাবছি ভোরবেলায় একটু ব্যায়াম করা দরকার, তাতে ব্লাডপ্রেশারটা কমবে। সাঁতারের থেকে ভাল ব্যায়াম আর কী আছে!"

কথা বলতে-বলতে ওরা স্টেশনের কাছে এসে পড়েছে। তুলসী দাঁড়িয়ে পড়ল সাইকেল সারাইয়ের দোকানের সামনে।

"সেদিন রাতে সাইকেলের টিউব পাংচার হয়ে কী বিপদে যে পড়েছিলাম কী বলব। সারাব বলে এই দোকানে দিতে এসে দেখি দোকান বন্ধ। তখন ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরি। পরদিন আবার হাঁটিয়ে এনে জটাধারীবাবুর দোকানে দিলাম। শুধু কি পাংচার? শরীরে ওরও অজস্র ব্যামো। ব্রেক, বেয়ারিং, চেন সবকিছুই খরখরে হয়ে গেছে। এ কি আজকের সাইকেল। আমার জন্মেরও আগে বাবা কিনেছিলেন।"

শুনতে-শুনতে বলরাম স্টেশনের দিকে তাকাচ্ছিলেন। প্ল্যাটফর্মে অফিসযাত্রী ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের ভিড়টা যেন একটু বেশিই। নিশ্চয়ই কোনও গোলমাল হয়ে ট্রেন বন্ধ রয়েছে।

খবরের কাগজের ওপর হাতে লেখা পোস্টার নিয়ে দুটি ছেলে দেওয়ালে সাঁটার জন্য জায়গা খুঁজছে। বলরাম তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলেন, ওভারহেড তারে বিদ্যুৎ নেই তাই সকাল আটটা থেকে ট্রেন বন্ধ। এমন ব্যাপার প্রায়ই ঘটে। মনে-মনে তিনি ঠিক করলেন, আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে দেখবেন, তার মধ্যে ট্রেন না এলে বাড়ি ফিরে যাবেন।

ব্যাঙ্ক বাড়ির দেওয়ালে, নানা দাবি জানানো পুরনো ছেঁড়া পোস্টারের ওপর ছেলেদুটি তাদেরটি মেরে দিল। বলরাম একবার তাকিয়ে পোস্টারটা দেখে নিলেন। সূর্য সঙ্ঘের পরিচালনায় একটা কী যেন দৌড় প্রতিযোগিতা। তিনি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোলেন।

"দিদি, সাইকেলটা এবার ছাড়ুন। এর আর কিছু নেই।" তুলসীকে উপদেশ এবং পরামর্শ দুটোই দিলেন প্রৌঢ় জটাধারী। একটি বালককে সহকারী নিয়ে তিনি নিজেই সাইকেল মেরামতির কাজ করেন।

"ব্রেকের যা অবস্থা, কোনদিন অ্যাকসিডেন্ট করে বসবেন, সামনের চাকার হাব-এর ওপর এই যে রডটা বসানো রয়েছে, এটা তো জং ধরে খরখর করছে। পেছনেরটারও একই অবস্থা। ভেঙে পড়লে আর দেখতে হবে না।"

"এখনও তো অ্যাকসিডেন্ট করিনি।" এই বলে তুলসী সাইকেল নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "সারাতে

গেলে টাকা লাগে, পাব কোথায় ?"

সাইকেলে চড়তে গিয়ে তার নজর পড়ল পোস্টারটা। সে পড়ার জন্য এগিয়ে গেল।

বিরাট দৌড় প্রতিযোগিতা
পরিচালনায় সূর্য সঙ্ঘ
মেয়েদের ১০ কিলোমিটার ও পুরুষদের ২০ কিলোমিটার। নাম দিবার শেষ দিন ৭ অক্টোবর। প্রবেশ মূল্য ১০ ও ১৫ টাকা।
চিত্তাকর্ষক পুরস্কার।

'পাঁচ মাইল রোড রেসে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছি।'— তুলসীর মাথার মধ্যে বাক্যটি বিদ্যুৎচমকের মতো চড়াৎ করে উঠল। মিথ্যাটাকে যদি সত্যি করতে হয় তা হলে এই সুযোগ। সত্যি-সত্যিই দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমে মিথ্যাটা খণ্ডাবার এই সুযোগ তার ছাড়া উচিত নয়। সূর্য সঙ্ঘ স্টেশনের পশ্চিমে, জগন্নাথকাকার বাড়ির কাছেই। ক্লাব ঘরটা সে চেনে। ঠোঙা বিক্রির টাকা থেকে এন্ট্রি ফি দশ টাকা সে আজই সন্ধ্যায় দিয়ে আসবে। দৌড়টা পাঁচ মাইল না হয়ে ১০ কিলোমিটার, তাতে কিছু যায়-আসে না। ১০ কিলোমিটার মানে তো ছ' মাইল। পাঁচের থেকেও বেশি। এটা তাকে জিততেই হবে। তুলসী সাইকেলে উঠে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল।

বলরাম আধঘণ্টারও বেশি অপেক্ষা করে ট্রেনের আর দেখা পেলেন না। ফিরে আসতে-আসতে পোস্টারটার দিকে আর একবার তাকিয়ে থেমে পড়লেন। খুঁটিয়ে পড়লেন। শুনেছিলেন বটে এখানে একটা বড় দৌড় প্রতিযোগিতা হয়, সেটা তা হলে এটাই বোধ হয়। তাঁর মনে ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠল তুলসীর কোঁচকানো চোখ দুটো। সাঁতার কম্পিটিশনের কোনও সুযোগ থাকলে মেয়েটার কোঁচকানো চোখকে ছানাবড়া করে দিতে পারেন এখনও।

বলরামের বুকের মধ্যে একটা চনমনে উচ্ছ্বাস ফেঁপে উঠল। নিজেকে তাঁর খুব শক্ত বলিষ্ঠ মনে হল। হ্যাঁ, এই বয়সেও তিনি গঙ্গায় চার-পাঁচ মাইল সাঁতরাতে পারবেন, শুধু একটু প্র্যাকটিস করে নিতে হবে, এই যা। পঁয়ত্রিশ বছর আগে সেই কাপটা জিতেছিলেন। এত বছর পর আর-একবার চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয় ? তুলসী বলল, ওদের গ্রামের পাশে রানিসায়র নামে বিরাট দিঘি আছে। ওখানে তো প্র্যাকটিস করা যায় ভোরবেলায়, সেইসঙ্গে ব্যায়ামটাও হয়ে যাবে।

কিন্তু চার মাইল যাওয়া আর চার মাইল আসা, সেটা কী করে হবে ? অসম্ভব ! মাথা নাড়তে-নাড়তে বলরাম রামপ্রসাদ হস্টেলের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় আড়চোখে দোতলার বারান্দার দিকে তাকালেন। সেদিনের পর থেকে ওদের গান গাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কেন বন্ধ হল কে জানে ! তবে এখনও তিনি হস্টেলের কাছাকাছি হলে কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

বাড়ির সামনেই তাঁর সঙ্গে দেখা হল সাইকেল হাতে ধরা পান্নালালের। স্টেশনের ওপারে মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে কেরানির কাজ করে। সাইকেলে যায়-আসে। বলরাম বললেন, "পানু, তুমি আছ ভাল। ট্রেনে চড়ে চাকরিতে যেতে হয় না, সাইকেলে দু'বার প্যাডেল মেরেই অফিসে ! আর আমাকে কিনা আজও কামাই করতে হল, ট্রেনের তারে বিদ্যুৎ নেই ! তোমার মতো একটা সাইকেল যদি থাকত তা হলে অফিসে চলে যেতাম। লেট হবে নিশ্চয়ই, তবু কামাইটা তো হবে না, তা ছাড়া এটা ভাল ব্যায়ামও।"

পানুর হেসে ওঠা উচিত ছিল বলরামের সঙ্গে। কিন্তু হাসল না। একটু অবাক হয়ে বলল, "বলুদা, আপনি সাইকেল চালাতে পারেন ?"

"কেন পারব না ? তেরো-চোদ্দ বছর বয়সেই কলকাতায় শিখেছি। সাইকেল চড়ে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়মঠ, এমনকী ব্যান্ডেল চার্চ পর্যন্ত গেছি। একবার দল বেঁধে ডায়মন্ড হারবার যেতে গিয়ে আমতলার কাছে একটা ষাঁড় শিং নেড়ে এমন তাড়া করল যে, পালাতে গিয়ে ডোবায় পড়লাম, মাথা ভাঙল। ব্যস, বাবা বললেন আর সাইকেল নয়। সেই আমার শেষ চড়া।"

পানু শুনতে-শুনতে বলরামের আপাদমস্তক দু'বার দেখে নিয়ে বলল, "বড়দের, না বাচ্চাদের সাইকেল চালাতেন ?"

প্রশ্নটা অবশ্যই তাঁর উচ্চতাকে কটাক্ষ করে। বলরামের রেগে ওঠা উচিত। রাগের বদলে হেসে উঠলেন তিনি।

"বলেছ ভাল।" হাসি চাপতে-চাপতে বললেন, "সত্যিই আমার পা প্যাডেল পর্যন্ত পুরো পৌঁছত না। সাইকেলের সিটটা নিচু করার জন্য যে রডের ওপর সেটা বসানো থাকে সেটা কেটে ছোট করে নিয়েছিলাম।"

"আমাদের চেয়ারম্যান একটা রেসিং সাইকেল বিক্রি করছেন, আপনি কিনবেন ?"

"তোমাদের চেয়ারম্যান সাইকেল চড়েন নাকি ?"

"উনি নন, ওঁর স্কুলে-পড়া ছোট ছেলে চড়ত। একজন সাইক্লিস্ট সকালে প্র্যাকটিস করার সময় গত বছর ট্রাকের ধাক্কায় মারা গেল জি. টি. রোডে। চেয়ারম্যানের বউ কাগজে সেটা পড়েই ছেলের সাইকেলটা নিজের শোবার ঘরে তুলে এনে এক বছর হল চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছেন।"

"ছেলে চেঁচামেচি, কান্নাকাটি করেনি ?"

"করেছিল। বাবা একটা স্কুটার কিনে দেবেন বলায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু সাইকেলটা উনি এখন বিক্রি করে দেবেন। কিনে নিন না !"

"দাম কত নেবে ?

"কিনেছিলেন দু' হাজারে, নিশ্চয়ই একটু কমই চাইবেন। মাস তিনেক মাত্র চালিয়েছে, খুব ভাল কন্ডিশনে আছে।"

বলরামের মনে হল একটা সাইকেল থাকলে রানিসায়র যাওয়া আর আসার সুরাহা হয়ে যায়। কিন্তু দু' হাজার থেকে একটু কম মানে কত টাকা ? দেড় হাজার ? অত টাকা দিয়ে কেনা তাঁর দ্বারা হবে না। তবু কিন্তু-কিন্তু করে বললেন, "শ' পাঁচেকে যদি হয় তা নিতে পারি, এর বেশি দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।"

"চেয়ারম্যানকে বলে দেখি, যদি রাজি হয়ে যান তা হলে নেবেন তো ?"

"আজই নেব।"

পান্নালাল সাইকেলে উঠে অফিস চলে গেল। বলরাম বাড়ি ঢুকলেন।

"এ কী, বাড়ি ফিরে এলে যে !" তাঁকে দেখেই বিমলা বললেন।

"ট্রেন বন্ধ।"

বলরাম ঘরে ঢুকলেন। পেছনে বিমলা। পাঞ্জাবির বোতাম খুলছেন, তখন বিমলা বললেন, "তোমার সঙ্গে ওই হস্টেলের ছেলেদের নাকি হাঙ্গামা হয়েছে ? পাশের বাড়ির কাজের মেয়েটা কোথা থেকে শুনে এসেছে।"

"হাঙ্গামা ? আমার সঙ্গে !" বলরাম অবাক হওয়ার ভান করলেন। "অসভ্যতা করছিল তাই বকে দিয়েছি, একে কি হাঙ্গামা বলে ? রাস্তা দিয়ে লোক যায়, ওরা পেছনে টিপ্পনি কাটে, ছড়া বলে। আমার বকুনির পর এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে।"

বিকালে পান্নালাল এসে জানাল, "চেয়ারম্যান পাঁচশোতেই রাজি, আজই আপনাকে টাকা দিয়ে দিতে হবে।"

সন্ধ্যাবেলায় তুলসী যখন সূর্য সঙ্ঘের ক্লাবঘরে দশ কিলোমিটার দৌড়ের এন্ট্রি ফি বাবদ দশ টাকা দিয়ে রসিদ নিল

তখন বলরাম পাঁচশো টাকা গুনে দিচ্ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে।

তুলসী যার হাতে এন্ট্রি ফি-র টাকা দিল তাকে সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা দাদা, প্রাইজ কী দেবেন আপনারা?"

একগাল হেসে এবং ভারিক্কি চালে লোকটি বলল, "অনেক প্রাইজ আছে। আমরা তিনজন স্পনসরার অলরেডি পেয়ে গেছি। সফট ড্রিঙ্কসের, পেইন্টসের আর গুঁড়ো মশলার কোম্পানি দিচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা করে। এখানকার 'আহার' কেটারিং আর 'গৃহলক্ষ্মী' টিভি-র দোকান কথা দিয়েছে তিন হাজার করে দেবে। 'পিকু' হোসিয়ারি ওদের নামছাপা গেঞ্জি দেবে সবাইকে, তাই পরে দৌড়তে হবে। আমরা আরও স্পনসরার জোগাড় করার চেষ্টা করছি, যাতে প্রত্যেককেই কিছু-না-কিছু প্রাইজ দেওয়া যায়। এ বছর মিনিমাম আমরা দেড় হাজার টাকার ফার্স্ট প্রাইজই দেব ছেলে আর মেয়ে বিভাগে।"

"ফার্স্ট প্রাইজ কী দেবেন?"

"এখনও আমরা ঠিক করিনি, কাল-পরশু মিটিংয়ে বসে কমিটি ঠিক করবে। কেউ বলছে রিস্ট ওয়াচ, কেউ বলছে টেপ রেকর্ডার, কেউ বলছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি, কেউ বলছে সাইকেল...।"

"সাইকেল!" তুলসী উচ্ছ্বসিত হতে গিয়ে ঢোক গিলল। "ওটা ছেলেদের, না মেয়েদের জন্য?"

লোকটি একটু তির্যক চোখে তাকিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে যেন কার্ট হয়েই গেছেন। ঠাকুরপাড়ার যুব সম্মেলনীর অনেক ছেলেমেয়ে নাম দেবে, ওরা রেগুলার ট্রেনিং করে।"

দমে গেল তুলসী। দৌড় কেন, কোনও খেলার নিয়মিত কোনওরকম ট্রেনিং-ই সে করেনি। বানিসায়রে সাঁতার আর সাইকেলে আট মাইল, একে ট্রেনিং বলে না। তবে তার দম আছে, শরীর কষ্ট নিতে পারে, হাতে-পায়ে জোর আছে। সে বইতে পারে, সইতে পারে, কোনও কিছুতে লেগে থাকতে পারে। এই তার পুঁজি, সে হাল ছাড়ে না।

কিন্তু এই দৌড়ে তাকে যদি প্রথম হতে হয়, তা হলে ট্রেনিং তাকে করতেই হবে। বাড়ি ফেরার সময় সে ঠিক করল, প্রতিযোগিতার তো এখনও দু' সপ্তাহ বাকি। সকালে, ছ' টায়, যে সময় দৌড়টা শুরু হবে ঠিক সেই সময়ে সেও রোজ দৌড়বে, ছ' মাইল।

॥ ৫ ॥

চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাইকেলটা হাতে ধরে বলরাম ঝকঝকে চোখে সেটার ওপর দিয়ে বারবার দৃষ্টি বোলালেন। পান্নালাল বলল, "খুব দাঁওয়ে পেয়ে গেলেন কিন্তু। বলুদা, খাওয়াতে হবে।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, ওপারে চলো, 'তৃপ্তি মহল'-এর জিবেগজা খাওয়াব।"

"জিবেগজা! এমন একটা সাইকেল পেয়ে তো লোকে নেমন্তন্ন করে মাংস-ভাত খাওয়ায়।"

"খাওয়াব, খাওয়াব।" বলরাম পরিতৃপ্ত স্বরে বললেন।

"এবার সাইকেলটায় চেপে একবার চালিয়ে দেখুন। মনে তো হয় প্যাডেল করতে অসুবিধে হবে না।"

বহু বছর বলরাম সাইকেলে চড়েননি। এখন সাইকেলে উঠতে গিয়ে ব্যালান্স হারিয়ে যদি পড়ে যান, তাও আবার পানুর সামনে।

"কিছু অসুবিধে হবে না, ও আমি দেখে নিয়েছি, সিটটা নিচুই আছে। বুঝলে পানু, সাঁতার আর সাইকেল একবার শিখলে জীবনে কেউ আর ভোলে না। চলো, হাঁটতে-হাঁটতে চলে যাই।"

"আপনি এগোন, এখানে আমার একটা কাজ আছে।" দু'পা এগিয়েই পান্নালাল ফিরে এল। "বলুদা, শুনলুম হস্টেলের ছেলেদের সঙ্গে নাকি আপনার গোলমাল হয়েছে ওই প্যারডি গান গাওয়া নিয়ে?"

"গোলমাল? আমার সঙ্গে?" বলরাম আকাশ থেকে পড়লেন এবং মনে-মনে সিঁটিয়ে গেলেন। "গুজব, গুজব। আচ্ছা, আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি গোলমেলে লোক? আমি শুধু ওদের রিকোয়েস্ট করেছি, নজরুলের গানের এভাবে বিকৃতি করা ঠিক নয়। তোমরা পারলে নিজেরাই গান বাঁধো। ওরা আমার কথা মেনে নিল।"

"ওহ, তাই এখন গান বন্ধ রয়েছে! বোধ হয় ভাবনাচিন্তা করছে নতুন গান বাঁধার জন্য।"

পান্নালাল চলে গেল। বলরাম সাইকেলটাকে হাঁটিয়ে রেল লাইনগুলো পেরিয়ে স্টেশন রোড ধরে এগোলেন। তাঁর একটু আগেই তুলসী কুলডাঙা রওনা হয়ে গেছে সাইকেলে।

বাড়িতে পৌঁছে বলরাম সাইকেলটা দরজার বাইরে রেখে চেঁচিয়ে বিমলাকে ডাকলেন, "দেখে যাও কী একটা জিনিস কিনে এনেছি, দেখে চমকে যাবে।"

ব্যস্ত হয়ে বিমলা রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন এবং না চমকালেও, অবাক হলেন। "ওমমা, এটা আবার কী!"

"রেসিং সাইকেল।"

"বলাই আবার রেসে নামবে নাকি পড়াশুনো ফেলে? না না, এখন ওকে এটা দিতে হবে না।"

"বলাইকে দেব কেন? আমি তো নিজের জন্য কিনেছি। খুব শস্তায় পেয়ে গেলাম।"

"তুমি চালাবে সাইকেল!" বিমলা হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন।

"হ্যাঁ চালাব, দেখবে?"

বলরাম হ্যান্ডেল দু' হাতে ধরে ডান পা তুলে লাফ দিলেন চড়ার জন্য। যতদূর তোলা দরকার, পা ততটা উঠল না, ফলে সাইকেল নিয়ে তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

"কাণ্ড দেখেছ!" বিরক্ত হয়ে বিমলা এগিয়ে এসে স্বামীকে টেনে তুললেন এবং বলরাম তুললেন সাইকেল। স্বামীর হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে হালকা সাইকেলটা কেড়ে নিয়ে বিমলা আর কথা না বলে সেটাকে হিঁচড়ে টানতে-টানতে বাড়িতে ঢুকলেন।

কলঘরের মধ্যে সাইকেলটা দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে রেখে বিমলা জানিয়ে দিলেন, "কাল চেন আর তালা কিনে এনে এটাকে বেঁধে রেখে দেব। এই বয়সে হাড়গোড় ভাঙলে আর জোড়া লাগবে না।"

"এই বয়স মানে!" বলরাম যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রকাশের চেষ্টা করলেন। "তুমি কি আমায় বুড়ো বলছ?"

"হ্যাঁ বলছি। বয়স তো পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে কবে!"

"তা হলেই কি লোকে বুড়ো হয়ে যায়? বার্ধক্য কি শুধু বয়স দিয়ে ঠিক হয়?" বলরামকে অবাক দেখাল।

"তবে না তো কী।"

রাত্রে ঘুম এল না বলরামের। ভোরের দিকে বিমলা যখন কাঁথা জড়িয়ে গাঢ় ঘুমে, তখন তিনি নিঃসাড়ে বিছানা থেকে উঠলেন। ট্রাউজার্স, বুশশার্ট আর জুতো পরে, কলঘর থেকে সাইকেলটা নিয়ে সদর দরজা খুলে বেরোলেন।

দরজার বাইরে রক। তার কিনারে সাইকেল রেখে, যেভাবে সেদিন তুলসীকে সাইকেলে উঠতে দেখেছিলেন, সেইভাবে রক থেকে সোজা সিটে বসলেন। প্যাডেলটা উলটো দিকে ঘুরিয়ে পরীক্ষা করলেন পা কতটা পর্যন্ত যায়। মোটামুটি পৌঁছচ্ছে। এবার তিনি প্যাডেলে চাপ দিয়ে এগোতে গিয়েই পড়ে গেলেন। কাছেই একটা কুকুর ডেকে উঠল। বলরাম সিঁটিয়ে গিয়ে রকে

বসে পড়লেন। এখনও অন্ধকার কাটেনি। কুকুরের ডাকে লোকজন জেগে উঠে তাঁকে চোর বলে যদি ধরে!

মিনিট পনেরো পর আবার তিনি চেষ্টা শুরু করলেন এবং চতুর্থবারে সফল হলেন, অর্থাৎ পড়লেন না। কিশোর বয়সে প্রথম শিখে সাইকেল চালানোর আনন্দের মতো প্রচণ্ড খুশিতে ভরে গিয়ে তারপর সাইকেল চালিয়ে দিলেন স্টেশনের দিকে।

ফাঁকা রাস্তা। দু'পাশের দোকানগুলি বন্ধ। বহু দোকানের সামনে খাটিয়ায় বা মাটিতে লোকে ঘুমোচ্ছে। লেভেল ক্রশিং পর্যন্ত পৌঁছে তিনি সাইকেল ঘোরালেন। ব্যায়ামের জন্য সাঁতার কাটতে হলে কাটা দরকার ভোরবেলাতেই, আর সেটা রানি সায়রেই। রানিসায়রটা কেমন সেটা এখন একবার দেখা দরকার। বলরাম কুলডাঙার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সর্বাগ্রে তাঁকে রমেনসারের বাড়িটা খুঁজে বের করে তুলসীকে সঙ্গে নিতে হবে।

বলরাম কোনওদিন এইদিকে আসেননি। তুলসীকে সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখেছেন যে রাস্তা দিয়ে, তিনি সেটা ধরেই চললেন। ভোর হতে শুরু করেছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না বটে— কিন্তু আলোর আভায় রাত্রের চিহ্নটুকু আকাশ থেকে মুছে গেছে। লোক চলাচল শুরু হয়েছে। তাঁর বাড়ির এত কাছে এমন ধানখেত আর কার্তিক মাসের পাকা ধান তিনি দেখতে পাবেন, স্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারেননি। পায়েসের মতো একটা গন্ধ মাটি থেকে উঠে আসছে। তাঁর মনে হচ্ছে, আজন্ম কলকাতায় আর শহরতলির মতো বিদ্যানগরে বাস করে, তিনি এখনও জানেনই না সেই কথাগুলোর মানে —'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল....' বলরাম বেসুরো হেঁড়ে গলায় গানটা গাইতে-গাইতে জোরে প্যাডেল শুরু করলেন।

শুধু দুটি লোককে জিজ্ঞেস করেই বলরাম পৌঁছে গেলেন তুলসীদের বাড়ি।

"তুলসী আছ নাকি, তুলসী?" বলরাম ডাকলেন বাঁশের বেড়ার বাইরে থেকে। বাবু বেরিয়ে এল, তার পেছনে ওর মা।

"তুলসী আছে নাকি?" মাকে উদ্দেশ্য করে বলরাম জিজ্ঞেস করলেন, অবশ্য আগে একটা নমস্কার করে নিয়েছেন।

"তুলসী তো ভোরেই বেরিয়েছে, ছোটার জন্য। ঘণ্ট দেড়েক পর ফিরবে।" তুলসীর মা প্রতিনমস্কার করে বললেন।

"না, না, দিদি তার আগেই ফিরবে।" বাবু শুধরে দিল তার মাকে।

"ওকে কি কিছু বলতে হবে?" মা জিজ্ঞেস করলেন।

"বলবেন মেসোমশাই এসেছিল। আমার নাম বলরাম গড়গড়ি। বিদ্যানগরে থাকি। স্টেশনেই ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ওকে বলেছিলাম সকালে রানিসায়রে আমি সাঁতার কাটব, সেইজন্যই এসেছি। সায়রটা তো আমি চিনি না।"

"তুলসী না থাক, বাবু তো আছে। বাবু তুই ওনাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দে না।"

মার কথায় বাবু বেরিয়ে পড়ল। মিনিট সাতেক গ্রামের ভেতরের পথ দিয়ে হেঁটে ওরা দু'জন রানিসায়রে পৌঁছল। প্রায় দেড়শো বিঘার এক জলাশয়। পাড়ের কাছে জলজ লতাপাতা, গুল্ম থাকলেও মাঝখানটা পরিষ্কার টলটলে। বাঁধানো ঘাট নেই। গ্রামের লোকেরা একটা জায়গা দিয়ে জলে নেমে-নেমে সেইখানটায় ঘাট তৈরি হয়ে গেছে।

বলরাম মুগ্ধ হলেন। গা জুড়নো বাতাস আর জলের সোঁদা গন্ধ তাঁর ফুসফুসকে যেন হাতছানি দিয়ে বলল, "এই হচ্ছে নির্মল তাজা অক্সিজেন টেনে নেওয়ার সময়। ফুসফুস তুমি কাজে নামো, সারা শরীরের কোষে-কোষে ছড়িয়ে দাও বিশুদ্ধ বাতাস। মাথার ক্লান্তি, দেহের ক্লান্তি সব মুছে ফেলে দেওয়ার এই তো সুযোগ!

সাইকেলটা ঘাসের ওপর শুইয়ে, বলরাম জুতো এবং জামা খুলে ফেললেন। বাবু অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে। ট্রাউজার্স খুলে জাঙ্গিয়া পরা বলরাম ছুটে গিয়ে দু' হাত তুলে জলে ঝাঁপালেন।

"আহ্হ।" একবার মাত্র তাঁর মুখ থেকে শব্দটা বেরোল। কত বছর পর আবার জলের সঙ্গে তাঁর নতুন করে আলাপ হচ্ছে। তিনি ধীরে-ধীরে সাঁতার কেটে রানিসায়রের পাড় থেকে প্রায় চারশো মিটার ভেতরে গিয়ে ফিরে এলেন। বারবার ডুব দিলেন, জল ছিটোলেন, মড়ার মতো ভাসলেন এবং "বাংলার মাটি, বাংলার জল" বলে চিৎকার করলেন।

প্রায় আধঘণ্টা জলে থেকে মুখে হাসি নিয়ে বলরাম রানিসায়র থেকে উঠলেন। বাবু বলল, "গামছা আনেননি? গা মুছবেন কী করে? দাঁড়ান, আমি ছুটে বাড়ি থেকে নিয়ে আসি!"

"আরে না, না, না। গায়ের জল এখনই বাতাসে শুকিয়ে যাবে। আজ প্রথম দিন তো, কতটা সাঁতরালাম বল তো?"

বাবু সায়রের দিকে তাকিয়ে চোখ কুঁচকে বলল, "যাতায়াতে আধ মাইল হবে। দিদি এর থেকেও বেশি যায়।"

"তা তো যাবেই, ওর অভ্যেস আছে। আর আমি তো বলতে গেলে নতুন জলে নামলাম।"

"দিদি, আপনার থেকেও জোরে সাঁতরায়।"

"তা তো সাঁতরাবেই, আমার থেকে বয়স অনেক কম।"

ভিজে জাঙ্গিয়ার ওপর ট্রাউজার্সটা পরে, জুতো পায়ে গলিয়ে বলরাম সাইকেলটা তুলে বললেন, "চলো, আজ এই পর্যন্ত।"

"জামাটা পরুন।"

"নাহ। সকালের এই নরম রোদে আলট্রা ভায়োলেট আছে। চামড়ায় লাগানো দরকার।"

বাড়ির কাছাকাছি এসে বাবু বলল, "দিদি, একটু পরেই তো আসবে, আপনি বসবেন আমাদের বাড়িতে?"

বলরাম মাথা নাড়লেন। "বাজার যেতে হবে, রান্না হবে, খেয়ে দেয়ে অফিস যেতে হবে। দিদিকে বোলো আমি কাল আসব।" একটু ভেবে যোগ করলেন, "রোজ আসব।"

বলরাম যখন তুলসীদের বাড়ি থেকে সাইকেলে উঠলেন তখন তুলসী রেলওয়ে ট্র্যাকের মাঝের স্লিপারের ওপর দিয়ে ছুটছে। হাতঘড়ি দেখে সে ছোটার বেগ বাড়াল। দশ কিলোমিটার দূরত্বের মাপটা পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সে জানে পরের রেল স্টেশন ঠাকুরপাড়ার দূরত্ব বিদ্যানগর থেকে ছ' কিলোমিটার। যাতায়াতে বারো কিলোমিটার। এটাকেই সে মাপ ধরে নিয়ে আপ লাইনে এক নম্বর ট্র্যাকের স্লিপারের ওপর দিয়ে দৌড়েছে।

ছোটার মধ্যে দুটি আপ ট্রেনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। পেছন ফিরে তাকিয়ে কোনও ট্রেন আসছে কি না দেখে নিয়ে সে দু' নম্বর ট্র্যাকে সরে যায়। স্লিপারগুলো কংক্রিটের এবং তাদের মধ্যেকার ব্যবধান প্রায়ই সমান মাপের নয়, ফলে তার অসুবিধে হচ্ছিল দৌড়ের ছন্দ রাখতে। কিন্তু এটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। সে জানে যে রাস্তা দিয়ে তাকে দৌড়তে হবে সেটা এর চেয়েও খারাপ।

বিদ্যানগর-ঠাকুরপাড়া, প্ল্যাটফর্ম থেকে প্ল্যাটফর্ম সে যাতায়াত করল, ঘড়ি ধরে পঁয়ষট্টি মিনিটে। শেষের দিকে কষ্ট হচ্ছিল। ইচ্ছে করছিল দাঁড়িয়ে পড়তে। কোমর, উরু ভারী হয়ে পা যেন আর উঠতে চাইছিল না। তবে সে জানে প্রথম কয়েকটা দিন এইরকমই হবে, তারপর ঠিক হয়ে যাবে।

বলরাম বাড়ি পৌঁছতেই বিমলা জানতে চাইলেন, "এই সাত সকালে খালি গায়ে কোথায় বেরিয়েছিলে?"

"সাঁতার কাটতে।"

"সাঁতার! সাইকেলে চেপে?"

"সাইকেলে চেপে সাঁতার কাটা যায় না। সাইকেলে চেপে জলের ধারে যাওয়া যায়, আর সেইজন্যই এটা কিনেছি। চার মাইল দূরে কুলডাঙায় বানিসায়র, সেখানে গিয়ে সাঁতার কেটে এলাম। দাও, ধুতি দাও, বাজার যাব। আর বলে রাখছি এবার থেকে রোজ ভোরবেলায় যাব। আমার দারুণ ভাল লাগছে নিজেকে।"

বিনয় হতবাক। তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন, প্রচণ্ড রাগে ফেটে উঠবেন।

বলরাম যখন অফিসে পৌঁছলেন, তুলসী তখন ঘরের মেঝেয় চিৎ হয়ে শুয়ে। বাড়ি ফিরেই সে শুনেছে, বলরাম এসে প্রায় সারাদিন সাঁতার কেটে গেছেন। সে অবাক হয়েছে রেসিং সাইকেলে চড়ে বলরামের আসার কথা শুনে। "মেসোমশাইয়ের সাইকেল আছে এটা তো জানতাম না।" তুলসীর দুটো পা মালিশ করে দিতে-দিতে মা বললেন, "প্রথম দিনেই কি এত পরিশ্রম করতে হয়... অভ্যাস নেই, ব্যথা তো করবেই। এখন চান করে দুটো ভাত খেয়ে নে, তারপর ঘুমো।"

যা কখনওই হয় না, আজ বলরামের তাই হল। অফিসে কাজ করতে-করতে তিনি ঘুমে ঢুলতে শুরু করলেন।

"ও গড়গড়িদা, আজ হল কী আপনার, ঘুমোচ্ছেন যে?" ফজল বানরু সত্যিই প্রবীণ।

চমকে দিশে হয়ে বসে বলরাম বোকার মতো হাসলেন। "বহু বছর পর আজ খুব সাঁতার কেটেছি।"

"সাঁতার? এই বয়সে? ডুবে যাবেন মশাই।"

"তা হলে হাফ-ছুটি পাবেন।"

"তা পাব। কিন্তু ব্যাপারটা কী, ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে নামবেন-টামবেন নাকি?"

বলরাম গম্ভীর মুখে বললেন, "হ্যাঁ।"

॥ ৬ ॥

সূর্য সঙ্ঘের প্রতিযোগিতার দিন সকাল ছটায় আগে সাইকেলে বেরিয়ে পড়লেন বলরাম। সঙ্ঘের সামনে থেকে শুরু হয়ে পুরুষ ও মেয়েদের প্রতিযোগিতা শেষ হবে ওখানেই। তার মধ্যে বিদেশের লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে মেয়ে প্রতিযোগীরা ছুটবে মহারাজা, ছোকরা পার হয়ে ডানদিকে বেঁকে জোড়াশোল। সেখান থেকে আবার ফিরে আসবে আগের রাস্তা ধরে। অতঃপর বিদেশের লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে এসে প্রথম হওয়া মেয়েটি সূর্য সঙ্ঘের ক্লাবঘরের সামনে সুরো ছিঁড়বে। ছেলেদের দৌড়ের দূরত্ব যেহেতু দীর্ঘ তাই তাদের পথ জোড়াশোল থেকে আরও প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে সখিপাড়ি পর্যন্ত গিয়ে তারপর তারা ফিরে আসবে।

ছেলেরা এবং মেয়েরা মোটামুটি কাছাকাছি সময়ে যাতে দৌড় শেষ করে, সেজন্য তাদের শুরুর সময়টাকে আগে-পিছে করা হয়েছে। ছেলেদের ২০ কিলোমিটার দৌড় শুরু হবে ছটায়। তার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর শুরু হবে মেয়েদের। ভোর ছটাতেই ক্লাবঘরের সামনের মাঠে লোক জমে গেছে। লাউড স্পিকারে অবিরাম নির্দেশ দেওয়া চলেছে। স্বেচ্ছাসেবকরা 'পিকু' লেখা হলুদ গেঞ্জি আর সাদা কাপড়ের টুপি পরে। রানারদের পথ বেঁধে নিয়ে যাওয়ার ও পাশে-পাশে যাবার জন্য সাইকেল নিয়ে তারা তৈরি হয়ে রয়েছে। প্রতি সাইকেলের হ্যান্ডেলে ক্লাবের পতাকার রঙের কাগজ কাটি দিয়ে বাঁধা।

প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করার জন্য প্রথমে ঠিক হয়েছিল রেলমন্ত্রী। কিন্তু সুদূরপাল সময়ে যাওয়ায় তাঁর বদলে মনোনীত হন স্থানীয় এম. এল. এ। কিন্তু তিনি গতকাল একটি জন্মদিনের নিমন্ত্রণে আহারের পরিমাণ ঠিক রাখতে না পেরে উদরিক গোলমালে পড়ে গেছেন। সকালে খবর পাঠিয়েছেন তিনি আসছেন না। অবশেষে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে প্রায় বিছানা থেকেই তুলে আনা হয়েছে। আসার আগে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, অন্তত দীপ জ্বালার সুযোগটা তাঁকে দেওয়া হোক। কিন্তু দেওয়া হয়নি।

কাঁটায়-কাঁটায় ছটায় চেয়ারম্যান, নজরে ভাসে ছিপি আঁটা একটা এয়ারগান আকাশের দিকে তুলে এগিয়ে এলেন। ছত্রিশজন প্রতিযোগী চুনের দাগ দেওয়া লাইনে হলুদ গেঞ্জি আর সাদা টুপি পরে ঠেলাঠেলি শুরু করল। তাদের অর্ধেকেরই খালি পা। বাকিদের পায়ে কেডস।

"কী বলতে হবে যেন বললে?" চেয়ারম্যান তাঁর পাশে দাঁড়ানো ক্লাব সচিবকে জিজ্ঞেস করলেন।

"আমরা স্যার বাংলা ভাষাকে মাতৃদুগ্ধ গণ্য করি। তাই আপনি বাংলাতেই বলুন— 'নিজের জায়গায় দাঁড়াও' ... 'তৈরি হও'— এই বলার পর ফায়ার করবেন।"

"গুড, ভেরি গুড। বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে, খেলার মধ্যেও। কিন্তু সকালের আগে একটা স্বাগত বা উদ্বোধনী ভাষণ দেওয়া উচিত নয় কি?"

"স্যার। এখনও আপনার দীপমালা হয়নি।"

"তা বটে। আচ্ছা, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় আমাকে ডেকো।"

চেয়ারম্যান এয়ারগান তুললেন, সচিব যা বলতে বলেছিলেন বললেন, ট্রিগার টিপলেন, কিন্তু ছিপিটা বেরোল না। দ্বিতীয়বার টিপলেন এবং 'ফুট' করল।

তাই যথেষ্ট। হইহই করে প্রতিযোগীরা ছোটা শুরু করে দিল। আর সঙ্গে-সঙ্গে লাউডস্পিকারে বেজে উঠল রেকর্ড: "চল চল চল। ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল, অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল, চল, চল।"

বলরাম স্টেশনের লেভেল ক্রশিংয়ের পাশে সাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গানটা শুনতে-শুনতে পায়ে তাল দিচ্ছিলেন। গানটা এখন তাঁর সত্যিই ভাল লাগছে। তিনি অপেক্ষা করছেন মেয়েদের দৌড় শুরু হওয়ার জন্য। লেভেল ক্রশিং খোলা, এখন কোনও ট্রেন আসছে না, বলরামের সামনে দিয়ে ছত্রিশজন দৌড়ে চলে গেল। তাদের পেছনে একটি জিপ। তাতে রয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম নিয়ে একজন ডাক্তার। স্টেশন রোড এখনও জমে ওঠেনি ভিড়ে। তবে বাড়ির বারান্দায়, জানলায়, ছাদে লোক।

মেয়েদের দৌড় শুরুর দেরি আছে। বলরাম ঠিক করলেন এই ফাঁকে বাজারটা সেরে নেবেন। থলি নিয়েই বেরিয়েছেন। তাঁর হাঁটার মতো বাজার করাটাও দ্রুত হয়ে থাকে। এখন হাঁটার বেগ সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় তিনি মন্থর হয়েছেন। কিন্তু বাজার করার জন্য সময় তিনি বাড়াননি। ঠিক পনেরো মিনিটে কাজ সেরে, একটা খবরের কাগজ কিনে আবার লেভেল ক্রশিংয়ে ফিরে এসে সেটা পড়তে শুরু করলেন।

তুলসীকে বলা হয়েছিল, দৌড় শুরুর একঘণ্টা আগে হাজির হতে। পৌনে ছটায় সাইকেল চালিয়ে এসে পৌঁছে সে ক্লাবঘরে একটা বেঞ্চে চুপচাপ বসে থাকে। একে-একে পুরুষ ও মেয়ে প্রতিযোগীরা আসতে থাকে।

তার চোখ ছিল মেয়েদের ওপর। অধিকাংশই তারই বয়সী, স্থানীয় মেয়েই সংখ্যায় বেশি। তবে তিনটি অচেনাকে তার মনে হল মহুলগাঁয়ের খুব সম্ভ্রান্ত। ভাল স্বাস্থ্য, গায়ের রোদ সাদা। ওদের একই আকাশী রঙের শর্ট, লাল ও নীল পাড় দেওয়া একই মোজা ও কেডস।

ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, হাসাহাসি করছে। এক সময় ওরা নানারকম ব্যায়াম শুরু করল। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তুলসীও সমীহ ও কৌতূহলভরে তাই দেখতে-দেখতে কিছুটা দমে

গেল।

এরা রীতিমত দু'বেলা ট্রেনিং করে। এরা অ্যাথলিট। কী ভাবে পা ফেলে দৌড়তে হয় সেটা একটা শেখার ব্যাপার। সে শেখেনি। দৌড়ের আগে শরীর গরম করা যে দরকার এটাও সে জানত না। একবার সে ভাবল, ওদের মতো শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে, লাফিয়ে, দুলিয়ে, বাঁকিয়ে নেবে নাকি। কিন্তু অদ্ভুত একটা লজ্জাবোধ তাকে বাধা দিল। ওরা তা হলে নিশ্চয় মুখ টিপে হাসবে। তবে চার মাইল সাইকেল চালিয়ে আসার পর এখন তার শরীরে চনমনে একটা সজীবতা পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওঠানামা করছে।

ছটা চল্লিশে মেয়েদের ডাকা হল স্টার্টিং লাইনে আসার জন্য। নাম দেওয়া আঠারোজনের মধ্যে চারজন অনুপস্থিত। মেয়েদের দৌড়ের উদ্বোধক স্থানীয় থানার অফিসার ইনচার্জ। ইনি বক্তৃতা দেওয়ার বিরোধী এবং এয়ারগান হাতে নিয়ে ক্লাব সচিবকে জানিয়েছিলেন, "জানি মশাই জানি স্টার্ট দেওয়ার জন্য কী বলতে হবে।"

"আমরা কিন্তু মাতৃভাষায় স্টার্ট... ।"

"অবশ্যই, অবশ্যই ... তুলনা হয় নাকি মাতৃভাষার!" এই বলেই দারোগাবাবু বিশেষ এক পুলিশি কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন, "অন ইওর মার্ক... গেট, সেট..." এবং তারপর 'ফুট'। সঙ্গে-সঙ্গে লাউডস্পিকারে বেজে উঠল রেকর্ড, "উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল... ।"

প্রবল উৎসাহে কিছু মেয়ে ছোটা শুরু করল এমনভাবে, যেন বিদ্যানগর স্টেশনে ছটার শুনেছে, তাদের এখন ট্রেন ধরতে হবে। তুলসী চোখ রেখেছে তিনটি মেয়ের ওপর। ওরা কী করে সেটা তাকে দেখে যেতে হবে।

লেভেল ক্রশিংয়ের ধারে ভিড় জমেছে, তার মধ্যে আছেন বলরামও। মেয়েদের আসতে দেখে ভিড়টা এগিয়ে গেল। স্থূলাকৃতি এবং হাতে ধরা সাইকেল এই দুইয়ের কারণে বলরাম সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। দুটি লোকের কাঁধের পাশ দিয়ে কোনওক্রমে মুখটুকু বের করে দেখলেন সাত-আটটি মেয়ে তাড়াহুড়ো করে দৌড়ে গেল। তাদের মধ্যে তুলসী নেই। ওদের দশ-বারো মিটার পেছনে ছ'-সাতজন মেয়ের একটি দল। সবার পেছনে একটি জিপ। বলরাম তুলসীকে দেখতে পেলেন। সাদা টুপি, হলুদ গেঞ্জি, কালো শর্টস, নীল কেড্স, পায়ে মোজা নেই। চোখের নজর ডান দিকে—বাকি মেয়েদের ওপর।

"গুডলাক তুলসী... গুডলাক।" বলরাম চেঁচিয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হল, তুলসী যেন মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখার চেষ্টা করল।

"পেছনের মেয়েগুলোই ঠিক ছুটছে, সামনের মেয়েগুলো ভুল করছে।" ভিড় ভেঙে যাওয়ার পর স্টেশন রোড ধরে হাঁটতে-হাঁটতে এক প্রবীণ বয়স্ক তাঁর পাশের লোককে কথাটা বললেন।

পেছন থেকে সেটা শুনে একজন তরুণ সন্দিগ্ধ গলায় বলল, "সামনের মেয়েরা ভুল করছে বললেন কেন?"

"দশ কিলোমিটার দৌড়তে হবে, সাতটা প্রায় বাজে, রোদ এবার চড়চড় করবে। দু'দিন হল আবার গরম পড়েছে। শুরুতেই অত জোর দিলে পারবে শেষ করতে? তার ওপর এই জঘন্য ভাঙাচোরা রাস্তা।"

বলরামের কানেও কথাগুলো গেল। লোকটির যুক্তিতে সায় দিয়ে তিনি যোগ করলেন, "ভাল মাঠে দৌড়তে যে পরিশ্রম হবে, তার ডবল লাগবে এই রাস্তায় দৌড়তে। এগুলো হিসেবের মধ্যে রেখে দৌড়ের স্পিড ঠিক করতে হয়।"

শুনতে-শুনতে তরুণটির মুখ বোকার মতো হয়ে গেল। "আমার বোনকে তো প্রথমেই একটা চার-পাঁচশো মিটারের বড় লিড নিয়ে দৌড়তে বলেছি!"

"ভুল করেছেন।" বলরাম বললেন।

"তা হলে কী হবে? তরুণটি ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে যেন পরামর্শ চাইল। "বারণ করে দিয়ে আসব?"

কথা না বলে বলরাম সাইকেলে উঠলেন। বাজারটা তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। একটু পরেই তিনি দেখলেন, সেই তরুণটি ঊর্ধ্বশ্বাসে তাঁর পাশ দিয়ে ছুটে গেল।

॥ ৭ ॥

হোতর থেকে ডান দিকে একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে জোড়াশোলে। এটা মাটির রাস্তা। গোরুর গাড়ি আর ভ্যান রিকশার চাকা রাস্তার দুই ধারে নালার মতো গর্ত করে রেখেছে। প্রায়ই রাস্তার দুই পাশ বসে পড়া। পঞ্চায়েত থেকে রাস্তা মেরামতের চেষ্টায় কয়েক বছর আগে যেসব ভাঙা ইট ফেলা হয়েছিল সেগুলোর উঁচিয়ে থাকা ছুঁচলো মাথা যুদ্ধক্ষেত্রে পুঁতে রাখা মাইনের মতো আচরণ না করলেও, পদাতিক গ্রামবাসীর কাছে দুঃস্বপ্ন।

হোতর-জোড়াশোল রাস্তার মোড়ে এখন বহু লোক জমা হয়েছে। তার মধ্যেই সাইকেল নিয়ে রয়েছেন বলরামও। মেয়ে প্রতিযোগীদের চোদ্দজনই জোড়াশোলের দিকে চলে গেছে। সেখানে ঘণ্টার মোড় ঘুরে তারা প্রত্যাবর্তন করবে। সবাই প্রতীক্ষা করছে সেইজন্যই।

এখানকার বহু মানুষই সাইকেল চড়া রমেনসারের মেয়েকে চেনে। তারা আশা করে আছে, তাদের পাশের গ্রাম কুলডাঙার মেয়েটিই প্রথম আসবে। বস্ত্র মাথায় এক চাষি বলরামকে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ বাবু, এখানে হতিসে কী?

"দৌড় হচ্ছে, দৌড়। মেয়েরা দৌড়চ্ছে।"

"কতডা দৌড়িবে?"

"দশ কিলোমিটার।"

"সেডা কতডা?"

"তিন কোশ।"

"অ।" চাষি চলে যেতে গিয়েও ফিরে এল। "দেখি যাই ক্যামন দৌড়য়।" বলরামের পাশে সে দাঁড়িয়ে গেল।

কে একজন কাঁসর এনেছে। সেটা বাজাতে শুরু করতেই ভিড় থেকে রব উঠল, "আসছে, আসছে।"

প্রথম আসছে ঠাকুরপাড়া যুব সম্মেলনীর দুটি মেয়ে। তাদের পাশে-পাশে পতাকা লাগানো সাইকেল নিয়ে এক পথপ্রদর্শক। ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। "রমেনসারের মেয়ে কই? ... সে অনেক পেছনে পড়ে।"

তুলসী তিনজনের পর এবং প্রথমজনের থেকে প্রায় তিনশো মিটার পেছনে। বলরাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন প্রথম দুটি মেয়ের মুখ। ছ' কিলোমিটার দৌড় হয়েছে। ওদের মুখে শ্রান্তির ছাপ, পদক্ষেপে অবসাদ। বলরামের মনে হল, নিজেদের টানতে-টানতে যেন ওরা এগোচ্ছে, একে দৌড় বলে না। অসমান, ভাঙাচোরা রাস্তার দৌড়ের অভ্যাস না থাকায় এবং বারবার গর্ত আর উঠে থাকা ইট এড়াবার জন্য সোজা পথে দৌড়ের সুযোগ না পাওয়ায় ওদের বাড়তি পরিশ্রম করতে হচ্ছে। ছোটার ছন্দও নষ্ট হয়ে গেছে। ওদের চোখে বিরক্তি। যুব সম্মেলনীর আর-একটি মেয়ে ছিল, সে গেল কোথায়? বলরাম তাকে দেখতে পেলেন না।

তৃতীয় মেয়েটি ছুটছে মাথাটি একদিকে হেলিয়ে আপনমনে কী যেন ভাবতে-ভাবতে। চোখ দুটি লাল। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে দূরপাল্লার দৌড়ে অনভ্যস্ত। বলরামের মনে হল, বেশিক্ষণ টিকবে না।

কিন্তু তুলসীর এ কী হল ! খোঁড়াতে-খোঁড়াতে আসছে কেন ! সঙ্গের সাইকেলের লোকটি জলের বোতল দিল ওর হাতে। তুলসী থেমে গিয়ে বোতলের জল তার দু' পায়ের কেড্‌সের ওপর ঢেলে বোতল ফিরিয়ে দিয়ে আবার ছোটা শুরু করল। লোকটি অপেক্ষা করতে লাগল একসঙ্গে আসা পঞ্চম ও ষষ্ঠ মেয়ে দুটির জন্য।

বলরাম লাফিয়ে সাইকেলে উঠলেন। তুলসী হোতরের মোড় থেকে বাঁ দিকে বেঁকে মাজাভাঙার রাস্তা ধরেছে। এই রাস্তাটায় কোনও এক সময় পিচ ও পাথরকুচি ঢালা হয়েছিল তার কিছু-কিছু চিহ্ন এখনও ছড়ানো আছে। এই রাস্তাটা তুলসী ও বলরাম দু'জনেই ভালমতো চেনেন।

"কী হল পায়ে ?" সাইকেলটা তুলসীর পাশে এনে চালাতে চালাতে উদ্বিগ্ন স্বরে বলরাম জিজ্ঞেস করলেন।

"কেড্‌সটা বাবুর।" ছুটতে-ছুটতে এককথায় তুলসী জানিয়ে দিল তার সমস্যাটা।

"খুলে ফেল। এখন তো রাস্তা একটু ভাল।"

"ঠোক্কর লেগে বুড়ো আঙুলে যন্ত্রণা.... বোধ হয় নখটা উঠে গেছে... ভীষণ লাগছে।" তুলসীর মুখ কুঁকড়ে গেল কথা বলার সঙ্গে।

"দাঁড়াও।" ধমকে উঠলেন বলরাম। "খোলো জুতো।"

তুলসী থেমে গেল। নিচু হয়ে জুতো দুটো খুলতেই বলরাম তা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, "ছোটো।" তিনি তুলসীর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটায় লাল ছোপ দেখতে পেয়েছেন।

পেছনের মেয়েরা একই দূরত্বে পেছনে রয়েছে। ওদের পক্ষে আর সম্ভব নয় ব্যবধানটা ঘোচানো। তুলসীর সামনের মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল কোমরে হাত রেখে। পেছনের জিপ এসে ওকে তুলে নিয়ে যাবে। মেয়েটি ম্লান হাসল যখন তুলসী তার সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। প্রথমের দুটি মেয়ে জোড় বেঁধে এতক্ষণ দৌড়ে এসেছে,এবার তাদের একজনকে বলরাম দেখল সাত-আট মিটার পিছিয়ে পড়েছে।

মাজাভাঙার তেঁতুলতলায় পৌঁছে বলরামের মনে হল, তুলসীকে যদি এই দৌড় জিততে হয়, তা হলে এখনই ওকে গতি বাড়াতে হবে,নইলে ব্যবধান ঘোচাবার জন্য সময় আর পাবে না।

"তুলসী ?"

বলরাম ডাকলেন। তুলসী একবার তাকাল তাঁর দিকে।

"সামনের দু'জনকে দেখা যাচ্ছে না, অনেক এগিয়ে গেছে। স্পিড বাড়াও।"

"আঙুলে লাগছে মেসোমশাই।"

তুলসীর দৌড়ের গতি বাড়ল না। রাস্তার দু'ধারে দর্শকদের সংখ্যা এবার ক্রমশ বাড়ছে। যতই বিদ্যানগরের দিকে এগোবে সংখ্যাটা ততই বাড়বে। দর্শকদের অনেকেই তুলসীকে সাইকেলে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছে। এখন তাকে দৌড়তে দেখে তারা অবাক হয়ে যাচ্ছে।

"লাগুক আঙুলে, তুমি শুধু আমাকে তাড়া করো।"

এই বলে বলরাম সাইকেলটা তুলসীর সামনে এনে চালাতে শুরু করলেন। তুলসী দৌড়ের জোর একটু বাড়াল। বলরাম পিছু ফিরে দেখলেন একবার, তারপর আর একটু জোরে সাইকেলে প্যাডেল করলেন। তুলসীও আর একটু গতি বৃদ্ধি করল।

"এই, এই মশাই, এটা কী হচ্ছে ?" পতাকা লাগানো সাইকেল নিয়ে হলুদ গেঞ্জি পরা একজন বলরামের পাশে চলে এল। "আপনি ওকে হেল্প করছেন, পেস সেটারের কাজ করছেন, এটা বেআইনি, জানেন ?"

"আরে মশাই, বয়ে গেছে আমার পেস সেটারের কাজ করতে।" সাইকেলের গতি একটুও না কমিয়ে রাগত স্বরে বলরাম বললেন। "আমি এখন স্টেশনে যাচ্ছি ট্রেন ধরতে। দেখলুম মেয়েটা খোঁড়াচ্ছে, আঙুল দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। তাই বললুম, 'খুকি একটু ফার্স্ট এড দিয়ে নাও, নইলে সেপটিক হয়ে যাবে।' মেয়েটিকে আপনারা একটু দেখুন। ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মরে গেলে আপনাদেরই তো দুর্নাম হবে।"

"ফার্স্ট এড বক্সটা জিপে আছে। আচ্ছা, আমি দেখছি।"

পতাকাধারী সাইকেলটা পেছন দিকে ঘুরিয়ে জিপের খোঁজে চলে গেল। লোকটি যেন ঘাবড়ে গেল ধনুষ্টঙ্কারে মরে যাওয়ার কথা শুনে। বলরাম হাসলেন এবং হাত নেড়ে তুলসীকে গতি আরও বাড়াতে ইশারা করলেন।

সামনের দুটি মেয়ের একজন, যে পিছিয়ে পড়ছিল, তুলসী তাকে পার হয়ে গেল বিদ্যানগরে ঢোকার মুখেই। তাকে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে মেয়েটি উৎকণ্ঠিত মুখে গতি বাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু তুলসী এখন ঊর্ধ্বশ্বাসে তাড়া করে যাচ্ছে বলরামের সাইকেলকে। মেয়েটি হাল ছেড়ে দিল। এবার সে প্রথমজনকে দেখতে পাচ্ছে। রাস্তা এখন আঁকাবাঁকা, প্রথম মেয়েটিকে কখনও দেখা যাচ্ছে আবার কখনও বাঁকের মুখে আড়ালে চলে যাচ্ছে। দু'ধারের ভিড় নেমে এসে রাস্তাটাকে সরু করে দিয়েছে।

বলরাম নির্বিকার মুখে সাইকেলের গতি একটু-একটু করে বাড়িয়ে যাচ্ছেন। রামপ্রসাদ হস্টেলের বারান্দায় সার-সার মুখ। দেখে বলরামের মনে ফুর্তি জাগল। তিনি গুনগুন গাইলেন, "মাথার উর্ধ্বে আছে মাদল, নিম্নে উতলা পদযুগল... পদযুগল ... পদযুগল।" দু' পায়ের চাপে বনবন প্যাডেল ঘুরছে।

প্রথম মেয়েটি বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। তার চোখে স্পষ্ট ভীতি। খালি পায়ের, কালো শর্ট্‌স পরা মেয়েটা তার কুড়ি মিটারের মধ্যে এসে পড়েছে। নাছোড়বান্দা চিনে জোঁকের মতো লেগে আছে তার সঙ্গে।

"সরে যান, সরে যান, রাস্তা পরিষ্কার রাখুন... মেয়েদের দশ কিলোমিটার দৌড়ের প্রতিযোগীরা সমাপ্তি সীমানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আপনারা পিছিয়ে যান।" দুই সাইকেল আরোহী চিৎকার করে হাত নাড়তে-নাড়তে পেছন থেকে এসে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। রাস্তায় নেমে আসা ভিড় তাতে একটুও সরল না।

"জায়গা করে দিন, দৌড়বার জায়গা রেখে আপনারা পিছিয়ে যান।" বলরামও হঠাৎ আগের দুই সাইকেল আরোহীর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে চেঁচাতে শুরু করলেন। তাঁর একটু আগেই যাচ্ছে প্রথম মেয়েটি এবং পেছনে তুলসী। দু'ধার থেকে জনতার উৎসাহধ্বনি আর হাততালিতে বলরামের চিৎকার ডুবে গেল।

"পথ থেকে সরে যান, সরে যান।" বলতে-বলতে বলরাম প্রথম মেয়েটির পাশে চলে এলেন। পেছনে তাকিয়ে দেখলেন তুলসী দাঁতে দাঁত চেপে তাঁর সাইকেলের পেছনের চাকার দিকে তাকিয়ে দৌড়চ্ছে। একবার সে মুখ তুলল। তখন বলরাম তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন, "এবার এগোও।" বলেই তিনি রাস্তার ধারে সরে গিয়ে সাইকেল থেকে নেমে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

স্টেশনের পুবদিকের লেভেলক্রশিং দেখা যাচ্ছে। প্রথম মেয়েটি বারবার পেছনে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে তুলসীকে। দু'জনের ব্যবধান বড়জোর তিন মিটারের। এখন দু'জনের লড়াই চলছে দম আর সহন ক্ষমতার মধ্যে। তুলসী জানে দুটো ব্যাপারে সে কারও চেয়ে কম নয়, সুতরাং এবার সে একটা শেষ চেষ্টা করবে। আঙুলের নখটা প্রায় উঠে গেছে। যন্ত্রণা নিয়ে, খোয়া, পাথর, গর্ত আর ঢিবিতে ভরা রাস্তায় খালি পায়ে সে এতটা দৌড়েছে একটা আশার পেছনে। সেই আশা এখন সম্ভাবনা হয়ে দেখা দিয়েছে। এবার নিজেকে নিংড়ে দিয়ে তার এই দৌড়ে

নামাকে সার্থক করে তুলতে হবে। নয়তো নিজের কাছে নিজে লজ্জায় মরে যাবে।

পুবের লেভেলক্রশিং পার হয়ে রেলের চার নম্বর ডাউন ট্র্যাকের মধ্যিখানে এক'পা ফেলে মেয়েটি হার্ডলারের মতো লাফিয়ে পার হল। তার ঠিক চার হাত পেছনেই তুলসী। তিন নম্বর আপ ট্র্যাকের মাঝে ডান পা ফেলে মেয়েটি বাঁ পা তুলেছে। পা-টি এবার সে রেললাইনের বাইরে ফেলবে। এই সময়ই তুলসীর চোখ পড়ল জায়গাটায়। মেয়েটি তার বাঁ পা যেখানে ফেলতে যাচ্ছে সেখানেই সেই গর্তটা। ঘাসে আর পাতায় ঢাকা। এই গর্তে পড়েই তার সাইকেলের টিউব পাংচার হয়েছিল। মেয়েটির পেছন থেকে তুলসী চকিতে বাঁ দিকে সরে গেল।

"আহুহ... মা গো।"

হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মেয়েটি। 'এই আমার শেষ সুযোগ', তুলসীর মনের মধ্যে দপ করে উঠল আশার একটা ঝলকানি। মেয়েটির পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সে দেখল জমিতে হাঁটু রেখে সে ওঠার চেষ্টা করছে।

ডাউন দু' নম্বর, তারপর আপ এক নম্বর রেল ট্র্যাক, তারপর পশ্চিমের লেভেলক্রশিং পার হয়ে তুলসী এমনভাবে ছুটতে শুরু করল, যেন কোনও উন্মাদ আত্মা তাকে ভর করেছে।

এবার 'প্রথম, প্রথম, প্রথম...' মন্ত্রের মতো শব্দটা সে মনের মধ্যে আওড়ে যেতে-যেতে সূর্য সঙ্ঘ ক্লাবঘরের সামনে পৌঁছল।

পনেরো ফুট ব্যবধানে দুটো বাঁশের খুঁটি ধরে দু'জন ছেলে। তাতে বাঁধা লাল পশমের সুতো। তুলসী হুমড়ি খেয়ে পড়ল সুতোর ওপর। সে দেখল একটি লোক তাকে দু' হাতে ধরে ফেলল। দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে আসার আগে সে শুনতে পেল কেউ চিৎকার করে বলছে, "জল, জল, অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

দ্বিতীয় হওয়া মেয়েটি সমাপ্তি রেখায় পৌঁছল তুলসীর দশ সেকেন্ড পরে। তৃতীয় মেয়েটি এল দু' মিনিট পর, মোট আটটি মেয়ে দৌড় শেষ করেছে। ছেলেদের কুড়ি কিলোমিটার দৌড়ে প্রথমজন সহজেই জিতল, প্রতিযোগিতা হয়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের মধ্যে। দৌড় শেষ করেছে তিনজন ছাড়া সবাই।

তুলসীকে শুইয়ে রাখা হয়েছে ক্লাবঘরের মধ্যে একটা বেঞ্চে। তাকে একটা ইঞ্জেকশন আর ট্যাবলেট দেওয়া হয়েছে। পায়ের বুড়ো আঙুলে ব্যান্ডেজ। নখটা আধখানা উঠে গেছে। ঘরভর্তি লোক। চারদিকে কর্মব্যস্ততা আর কোলাহল। পুরস্কার দেওয়ার অনুষ্ঠানের জন্য তোড়জোড় চলছে। মেয়ে প্রতিযোগীরা এরই মধ্যে পাশের বাড়ির একটি ঘরে গিয়ে পোশাক বদলে এসেছে।

তুলসী উঠে বসল। এধার-ওধার তাকিয়ে সে বলরামকে খুঁজল। দেখতে পেল তার সাইকেলটা একধারে রাখা। হ্যান্ডেলে ঝুলছে কাপড়ের থলি, যার মধ্যে আছে তার সালোয়ার-কামিজ। কেড্স জুতো পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল, সেটা তো পথেই তুলে নিয়েছেন মেসোমশাই। দ্বিতীয় হওয়া মেয়েটি খয়েরি ট্র্যাকসুট পরে দুটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। তুলসীর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় সে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বলল, "তোমার যা বরাত, আজ একটা লটারির টিকিট কিনে নিয়ো।"

তুলসী ম্লান হেসে মেয়েটির হাতটা ধরেই ছেড়ে দিল। সত্যিই বরাত-জোরে সে জিতেছে। গর্তটাই তাকে জিতিয়ে দিল, না কি মেসোমশাই মাঝপথ থেকে সাইকেলে তাকে প্রায় টেনেই নিয়ে এলেন, সেটা এখনও সে বুঝে উঠতে পারছে না। তার মনের মধ্যে একটা খচখচানি শুরু হয়ে গেল। এই জয়টাকে পুরো উপভোগ করতে কোথায় যেন তার বাধছে।

"এখন শরীর কেমন লাগছে?" কর্মকর্তাদের একজন। গ্লুকোজের জলভরা গ্লাসটা তুলসীর হাতে দিয়ে তিনি বললেন, "খেয়ে নাও। জামাকাপড় বদলে, চুলটুল আঁচড়ে নাও। এখনই তো প্রাইজ দেওয়া হবে। এই সাইকেলটা তো তোমার?"

"হ্যাঁ।"

"বাড়ি কদ্দূরে?"

"কুলডাঙায়।"

"সে তো অনেকটা পথ। এখনই ফিরে যেতে অসুবিধে হলে কিছুক্ষণ কারও বাড়িতে বিশ্রাম নিতে পারো।"

তুলসীর একবার মনে হল বলে, এখানে তার দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় থাকেন, তেমন বুঝলে তাঁর বাড়িতেই যাব। তারপরই ভাবল, জগন্নাথকাকা যদি বিব্রত হন। ছুটির দিন ওঁর বাড়িতে অনেক লোকজন আসে।

মাঠের ওপর কাঠের পাটাতনে তৈরি ছোট মঞ্চ। পুরুষ ও মেয়েদের প্রাইজগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে টেবিলে। ছোট-বড়, চৌকো, লম্বা নানারকম বাক্স আর প্যাকেটের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে রাখা একটা নতুন সাইকেলও দেখা যাচ্ছে। টেবিলের পেছনে কয়েকটি চেয়ার, তাতে বসে আছেন সভাপতি, প্রধান অতিথি ও ক্লাবকর্তারা। তাঁদের পেছনে একটি সোনালি কাপড়ের ফেস্টুনে লেখা সূর্য সঙ্ঘ। স্থাপিত ১৯৭০। চতুর্দশ বর্ষ ১০ ও ২০ কি.মি. রোড রেস।

সাইকেলটা দেখেই তুলসীর দেহ থেকে সব ক্লান্তি এবং আঙুলের যন্ত্রণা নিমেষে উবে গেল। অবশ্যই ওটা প্রথম পুরস্কার। দারুণ দরকারী জিনিস। এই পুরনো সাইকেলটা তার এখন চাপতে ভয় করে, কখন যে বসিয়ে দেবে পথের মাঝে, কে জানে। তুলসী ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এসে দাঁড়াল আর ভাবল এই সাইকেলটায় চড়ে যদি বাড়ি ফেরে তা হলে বাবা, মা, বাবু কী অবাকটাই না হবে। কিন্তু সে তো পরের কথা। এখন সে এই পুরনোটাকে নিয়ে কী করবে? শেষে কি দু' হাতে দুটোকে ধরে হাঁটতে-হাঁটতে ফিরতে হবে নাকি? মেসোমশাই কোথায় যে ডুব মারলেন, উনি থাকলে না হয় পুরনোটা ওঁর হাতে দিয়ে বলতে পারত, এখন আপনার বাড়িতে রেখে দিন, কাল-পরশু নিয়ে যাব। কিংবা জগন্নাথকাকার বাড়িতেও রেখে আসা যায়। পেছনের উঠোনে একটা রাত থাকলে ওঁদের নিশ্চয় অসুবিধে হবে না।

"এবার আমাদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আরম্ভ হচ্ছে।" ক্লাবের সচিব মাইকের সামনে। রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নাটুকে ভঙ্গিতে বললেন, "বেলা বাড়ছে, রোদের তেজ তীব্র হচ্ছে, ছুটির দিনে মানুষের নানারকম কাজকর্ম থাকে, তাই অনুষ্ঠানকে আমরা দীর্ঘ করব না। আমরা কথার থেকে কাজে বিশ্বাসী, তাই কোনও বক্তৃতা বা ভাষণ কেউ দিচ্ছেন না। আমাদের এই বাৎসরিক দৌড় উপলক্ষে আগামী মাসে রবীন্দ্র ভবনে যে সাংস্কৃতিক-সন্ধ্যা হবে সেখানে এঁরা বক্তৃতা দেবেন, এখানে নয়।"

সচিবকে থামতে হল জনতার সমর্থনসূচক হাততালিতে। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হতাশায় চেয়ারের পিঠে এলিয়ে পড়লেন। ক্লান্ত প্রতিযোগীদের মুখে ফুটে উঠল স্বস্তি।

"প্রথমে পুরুষদের কুড়ি কিলোমিটার দৌড়ের বিজয়ী, বারাসাতের নেতাজি বাহিনী ক্লাবের সদস্য মহম্মদ জয়নুল ইসলামের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন আমাদের পুরসভার প্রধান শ্রীবিজয়কুমার পাল।"

চেয়ারম্যান চেয়ার থেকে উঠে মঞ্চের একপাশে রাখা সাইকেলটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কৃশকায়, ট্রাউজার্স ও বুশশার্ট পরা এক তরুণ মঞ্চের পেছনে লাগানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল হাসিভরা মুখে। তুমুল হাততালি উঠল।

তুলসী দু' হাতে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করে ফেলল। তার মনে হচ্ছে, সে বোধ হয় আর-একবার জ্ঞান হারাবে। একটা স্বপ্নের

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বেলুন সে ফুলিয়ে যাচ্ছিল, এখন হাতে পিনের খোঁচা পড়ল। বেলুন ফাটার শব্দটা বুকের মধ্যে শুনতে পেল।

"এই সাইকেলটি দান করেছেন স্থানীয় সাইকেল ব্যবসায়ী 'দি বেঙ্গল সাইকেল স্টোর্স'-এর মালিক শ্রীকালিপদ দাস মহাশয়। ...।"

তুলসী ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল। তার আর দেখার বা শোনার কোনও আগ্রহ নেই। ছেলেদের পর মেয়েদের পুরস্কার দেওয়া হবে। নিজেরটা নিয়েই সে সাইকেলে উঠে বাড়িমুখো হবে। তাকে যাই দেওয়া হোক, সাইকেল তো দেওয়া হবে না! এখানে বসে-বসে অন্যদের প্রাইজ নেওয়া দেখার কোনও দরকার তার আর নেই। খাবারের বাক্স দেওয়া হয়েছে সব প্রতিযোগীকে। অনেকেই পাওয়ামাত্র খিদের তাড়নায় খেতে শুরু করে দেয়। তুলসী খায়নি। এখন সে বাক্সটা খুলে দেখল, তাতে রয়েছে লুচি, আলুর দম, সন্দেশ, সিদ্ধ ডিম আর কলা। সে কলাটা বের করে বাক্সটা আবার তার ঝুলির মধ্যে রেখে দিল।

ছেলেদের পুরস্কারগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। স্থানীয় একজনও কেউ পুরস্কার পায়নি। বারাসাতের দু'জন, ইছাপুর, চাকদা আর আগরপাড়ার ছেলেরা প্রথম পাঁচটি স্থান জিতেছে।

"এবার মেয়েদের পুরস্কারগুলো দেওয়া হবে। দশ কিলোমিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছে কুলডাঙার তুলসী রায়।" হাততালি পড়ল, কিন্তু তুমুলভাবে নয়।

তুলসী যখন মঞ্চে ওঠার সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে তখন তার কানে এল একটা কথা, "বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে প্রথম। ঠাকুরপাড়ার মেয়েটা হোঁচট খেয়ে না পড়লে..."

তুলসীর দুটো কান গরম হয়ে গেল। কথাটা কে বলল দেখার জন্য মুখ ফিরিয়ে দেখল না। মাথা নামিয়ে সে মঞ্চে উঠল। তার জয়টা পরিচ্ছন্নভাবে নয়, এতে কলঙ্ক লেগে আছে। কিন্তু সে তো ইচ্ছে করে গর্তটা তৈরি করে রাখেনি। কিন্তু লোকে সে যুক্তি মানবে না। তার মনে হল, প্রথম না হলেই যেন ভাল হত। এখন সে অবসাদ বোধ করছে।

"বিজয়িনীর হাতে পুরস্কার তুলে দিতে অসুস্থ শরীর নিয়েও এসেছেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রীযুধিষ্ঠির সাহা। তিনি আমাদের বলেছেন, আপনাদের জানিয়ে দেওয়ার জন্য—খেলাধুলোয় উৎসাহ দেওয়ার জন্য রোগশয্যা কেন, শ্মশানের চিতা থেকেও তিনি উঠে আসবেন।" কিছু করতালিধ্বনি উঠল।

যুধিষ্ঠির সাহা চেয়ার থেকে নিজের ভুঁড়িটি কষ্টেসৃষ্টে তুলে উঠে দাঁড়ালেন। মাইকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সচিব বাধা দিয়ে বললেন, "না, না, ভাষণ নয়, টেবলের দিকে যান।"

লাজুক স্বরে বিধায়ক বললেন, "অভ্যাস তো!"

একটা বাক্স থেকে টেপ রেকর্ডার বের করে সচিব তুলে ধরে দর্শকদের দেখালেন। "স্থানীয় বিখ্যাত ইলেকট্রনিক দ্রব্য ব্যবসায়ী ও টিভি-র দোকান 'রূপ ও বাণী'র মালিক শ্রীঅরুণাভ পাল মহাশয় এই টেপরেকর্ডারটি দান করেছেন। দৌড়বার এই জুতোজোড়া দান করেছেন স্থানীয় 'পদসেবা'র মালিক শ্রীজয়দেব গোস্বামী। আর এই ট্র্যাক স্যুটটি দিয়েছেন পিক্ হোসিয়ারির স্বত্বাধিকারী গোবর্ধন শীল।" সচিব একজোড়া জুতো তুলে ধরে সবাইকে দেখালেন।

পুরস্কারগুলির সঙ্গে তুলসী পেল, পুরুষ বিজয়ীর মতোই একটি কাপ ও সার্টিফিকেট। মঞ্চ থেকে নেমে সে ক্লাবঘরের দিকে যাচ্ছিল তার সাইকেলটা আনতে। তখন দেখল সদ্য পাওয়া নতুন সাইকেলটি হাতে ধরে জয়নুল ইসলাম কয়েকটি ছেলের সঙ্গে গল্প করছে। কিছু একটা ভেবে নিয়ে তুলসী ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

"আপনাকে তো অভিনন্দনই জানানো হয়নি।" তুলসী হেসে হাত বাড়িয়ে দিল। জয়নুল হতমত হয়ে তাড়াতাড়ি তুলসীর

হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, "আমারও তো আপনাকে অভিনন্দন জানানো হয়নি।"

"আর অভিনন্দন!" বিষণ্ণ মুখে তুলসী বলল, "লোকে যা বলাবলি করছে। মেয়েটা নিয়ে পড়ে গেল, সেটা কি আমার দোষ? অথচ দেখুন লোকে বলছে আমার প্রথম হওয়াটা নাকি... ইচ্ছে করছে এই প্রাইজ ফাইজ ছুড়ে ফেলে দিই।" তুলসী টেপ রেকর্ডার, জুতো, কাপ হাত থেকে ছুড়ে ফেলার ভঙ্গি করল।

"আরে ফেলবেন কেন, লোকের কথায় কান দিতে নাই। দশ কিলোমিটার দৌড়েছেন, সেটা তো মিথ্যে নয়।" জয়নুলের পাশে দাঁড়ানো তরুণটি সহানুভূতি জানিয়ে বলল।

"না, আমার ভাল লাগছে না এইসব জিনিস। আপনি এই রেকর্ডার আর জুতোজোড়া নেবেন?"

"আমি! আপনার জিনিস?" জয়নুল আকাশ থেকে পড়ল।"

"হ্যাঁ। নিন না। বদলে আমি বরং সাইকেলটা নেব। হরেদরে দাম একই হবে। তা ছাড়া এখান থেকে সাইকেল নিয়ে বারাসাত যাওয়াটাও তো এক ঝামেলার ব্যাপার।" তুলসী বহু আশা নিয়ে অবশেষে ঝুলি থেকে তার বোড়ালটি বের করল।

"কিন্তু দিদি, সাইকেলটা অলরেডি তো বুক হয়ে গেছে। ওটা আমিই নিচ্ছি।" সহানুভূতি জানানো তরুণটি একগাল হাসল। "ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি কিনতে জয়নুল দু' হাজার টাকা ধার নিয়েছিল, শোধ হতে এখনও আটশো টাকা বাকি। দোকানে জিজ্ঞেস করে দেখি সাইকেলটার দাম কত হবে। মনে তো হয় টাকা শোধ হয়ে যাবে।"

তুলসী মিইয়ে গেল শুনতে-শুনতে। মুখে হাসি টেনে বলল, "দেনার টাকা শোধ তো সবার আগে করতে হয়। আচ্ছা, আমি চলি।"

তিক্ত, ক্লান্ত তুলসী সাইকেলে ফিরছিল। রামপ্রসাদ হস্টেল পার হয়েই দেখল বলরাম। হাত তুলে দাঁড়িয়ে।

"কী ব্যাপার মেসোমশাই। আপনি সেই যে হাওয়া হয়ে গেলেন, তারপর তো আর দেখতেই পেলাম না।"

"পথে সন্দেহ করে আমাকে একজন ধরেছিল পেস সেটারের কাজ করছি বলে। তোমাকে ডিসকোয়ালিফাই করে দিতে পারে, এই ভেবে পরে আর মুখ দেখাতে সাহস পাইনি। প্রায় শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছলুম তো।" বলরাম তৃপ্তির হাসি হাসলেন।

আর জ্বলে উঠল তুলসীর মাথা। গর্তে পড়ে গেল বলে প্রথম হতে পারল না... সাইকেলে আগে-আগে গিয়ে তার দৌড়ের স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছিল বলে... কোনও কৃতিত্বই নেই আমার, কিছুই নেই, সবই অন্যের দয়ায় পাওয়া।

"আজ আমার বাড়িতে তোমার নেমন্তন্ন। চলো, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি।"

"দরকার নেই আপনার নেমন্তন্নের।"

বোকার মতো চেয়ে থাকা বলরামকে দাঁড় করিয়ে রেখে তুলসী জোরে-জোরে প্যাডেল শুরু করল।

॥ ৮ ॥

তুলসীর ওইরকম রুক্ষ প্রত্যাখ্যানে বলরাম খুবই মনে আঘাত পান। সেদিন বাড়ি ফিরে আসতেই বিমলা বলেন, "কই, মেয়েটি এল না? রান্নাবান্না সব তো হয়ে গেছে, চাটনিটা শুধু বাকি।"

"দেখতে তো পেলুম না। একটা মেয়ে ফিরছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলুম, বলল প্রাইজ তো অনেকক্ষণ দেওয়া হয়ে গেছে। তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলুম। আমার মনে হয়, স্টেশনের ওপারে তুলসীর এক কাকা থাকেন, বোধ হয় তাঁর বাড়িতেই ও গেছে।"

"মিছিমিছি তাড়াহুড়ো করে এত রাঁধলুম। তোমার উচিত ছিল ওকে আগেই বলে রাখা। ঘটে এতটুকু যদি বুদ্ধি থাকে।"

বলরাম সেদিন এইভাবে স্ত্রীর কাছে নিজের মুখরক্ষা করে ছিলেন। কিন্তু মনের গভীরে সূক্ষ্ম একটা অপমানের জ্বালা ধরে গেল। নেমন্তন্নটা তো উপলক্ষ, আসলে ওর এই জয়কে মর্যাদা দেওয়ার জন্যই তো তিনি তাড়াতাড়ি মাসে কিনে সঙ্গে দই-রসগোল্লা নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। রাস্তায় অপেক্ষা করতে করতে দেখার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, আচমকা নেমন্তন্নের কথা শুনে তুলসীর মুখ-চোখের অবস্থাটা কেমন হবে!

রানিসায়রে সকালে সাঁতার কাটতে যাওয়া তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি চান না তুলসীর সঙ্গে আর দেখা হোক। রাস্তার আলাপ রাস্তাতেই শেষ হোক, এমন এক মনোভাব তাঁর। সাইকেল নিয়ে আর তিনি বেরোন না। অফিস আর বাড়ি ছাড়া আর তাঁর করার কিছু নেই। এমনই এক সময় কাগজে তিনি দেখলেন ছোট্ট একটা খবর, 'গঙ্গাবক্ষে চার মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা'। সামন্তপুর স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে বৈদ্যপাড়া বাঁধাঘাট থেকে সামন্তপুর কালীতলা ঘাট পর্যন্ত সাঁতার প্রতিযোগিতায় নাম দেওয়ার শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর। অফিসের মনোজ সামন্তর বাড়ি তো সামন্তপুরেই। বলরাম খবরের কাগজ হাতে ভাবতে শুরু করলেন।

পরদিন অফিসে ছুটির কিছু আগে বলরাম মনোজকে প্রশ্ন করলেন নিচুস্বরে, "আচ্ছা সামন্ত, তোমাদের ওখানে সামন্তপুর স্পোর্টিং ক্লাব বলে একটা ক্লাব আছে না?"

মনোজ সামন্ত ঘাড় বাঁকিয়ে চোখ পিটপিট করে বললেন, "আপনি জানলেন কী করে?"

"কাগজে দেখলুম গঙ্গায় একটা সাঁতার প্রতিযোগিতা করছে।"

"আমার ঠাকুর্দার বাবা পতিতপাবন সামন্ত ক্লাবটা এসটাব্লিশ করেন সেই বছরেই, যে বছরে মোহনবাগান ক্লাব হয়, তা মানে এইট্টিন এইট্টিনাইনে। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের উদ্বোধন করার কথা ছিল, আসতে পারেননি। দু' মাস পরে অবশ্য এসেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এসেছেন।" মনোজ সামন্ত খুবই সাধারণ একটা খবর জানানোর ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে হাই তুললেন। "বিগ নেম কত আর কবব, লাস্ট এসেছিলেন সত্যজিৎ রায়, আমাদের ঠাকুর দালান দেখতে।"

"ক্লাবটা তোমাদের বাড়িতেই কি?"

"ছিল। কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকারের যুগ আসতেই ক্লাবঘরটা বাড়ি থেকে তুলে দিলাম। এখন গঙ্গার ধারে আমাদের দেওয়া জমিতেই নতুন ঘরে ক্লাব।"

"ভাই, আমার একটা উপকার করবে। গঙ্গায় যে চার মাইল সাঁতার হবে তাতে আমার নামটা তুমি এন্ট্রি করে দেবে? বলরাম লাজুক ফিসফিসে গলায় বললেন। "তা হলে আমায় আর যেতে হয় না নাম দিতে।"

মনোজ সামন্ত প্রথমে বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে বলরামের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, গম্ভীরভাবে বললেন, "ঠাট্টা করছেন?"

"একদমই নয়। খুব সিরিয়াস হয়েই বলছি।"

"কেন?"

"তার মানে?"

"কেন এই বয়সে শরীরটাকে মিছিমিছি বেগার খাটাচ্ছেন? সেদিন অফিসে ঘুমোচ্ছিলেন, মনে আছে? আপনি সাঁতার কাটলে কারও কি কোনও উপকার হবে? আপনার কি সেঞ্চুরি মাইলে বাড়বে? তা যদি না হয় তা হলে সাঁতার কেটে লাভ?"

"খাঁটি কথা বলেছ ভাই। এখন তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সাঁতার কাটার কেটে কোনও লাভ হয় না। তবে কী জানো সামন্ত, মানুষ তো একরকমের হয় না। কেউ-কেউ মনে করে,

জীবন বলতে যদি বেঁচে থাকা বোঝায়, তা হলে বাঁচার একটা মানে থাকা দরকার। জীবন নানা সময়ে নানা রূপ ধরে। আমি এখন জীবনের যেখানে এসে পৌঁছেছি সেখানে দেখছি জীবনটা চেন দিয়ে বাঁধা কুকুরের রূপ ধরেছে। আমি তাই চেনটা ছিঁড়ে ফেলতে চাই।"

মনোজ সামন্ত মন দিয়ে শুনছিলেন। অনেকক্ষণ পর বললেন, "আপনার নাম আমি দিয়ে দেব।" তারপর হেসে উঠে জুড়ে দিলেন, "ডুবেটুবে গেলে কিন্তু লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে।"

বলরাম স্ত্রীকে জানাননি সাঁতার প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছেন। শুধু বলেছিলেন, মনোজ সামন্ত রবিবার অফিসের কয়েকজনকে বাড়িতে খেতে বলেছে, তিনিও তাদের মধ্যে আছেন।

সাঁতার শুরু হবে বেলা তিনটেয়, বৈদ্যপাড়া থেকে। বলরাম প্রথমে এলেন শেয়ালদা স্টেশনে। সেখান থেকে বাসে হাওড়া স্টেশনে এসে পেয়ে গেলেন বান্ডেল লোকাল। বৈদ্যপাড়া স্টেশনে নামলেন বেলা দুটোয়। সাইকেল রিকশায় গঙ্গার ধারে পৌঁছে দেখলেন, অস্থায়ী একটা শামিয়ানা আর পোশাক বদলাবার জন্য ঘেরা জায়গা। একটা টেবল আর কয়েকটা চেয়ার। জনা-তিরিশ ছেলেমেয়ে আর কিছু ক্লাবকর্তা। এদের সঙ্গে মনোজ তার জন্য অপেক্ষা করছে। ওকে দেখে বলরামের একটা চিন্তা থেকে রেহাই ঘটল। প্রতিযোগী বলে শনাক্ত করার জন্য একটা লোক পাওয়া গেল।

বলরাম একজন প্রতিযোগী শুনে দু-চারজন চোখ কুঁচকে তাকালেন। বলরাম অনুমান করেই ছিলেন, এইরকম দৃষ্টির সামনে তাঁকে পড়তে হবে। তিনি কিছু মনে করলেন না। একজন শুধু তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "গঙ্গায় কখনও সাঁতার কেটেছেন?"

"কেটেছি। সাত মাইল কম্পিটিশনের একটা কাপও আছে।" বিনীতভাবে বলরাম জানিয়ে দিলেন।

মনোজ সামন্ত ক্লাবের লোকেদের সঙ্গে বলরামের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "এনার্জি আছে বটে গড়গড়িদার! এইসব ইয়াং ছেলেমেয়ের সঙ্গে কম্পিট করতে এই বয়সে জলে নামা, চাট্টিখানি কথা! ওঁকে তো একটা স্পেশ্যাল প্রাইজ দেওয়া উচিত!"

"তা যদি দাও তা হলে ওকেও দেওয়া উচিত।" এই বলে বলরাম পোশাক বদলাবার জায়গা থেকে এইমাত্র বেরিয়ে আসা ছোট্ট বিনুনি ঝোলানো কস্টিউম পরা একটি সাত-আট বছরের মেয়ের দিকে আঙুল তুললেন। "ওর সঙ্গে আমার বয়সের ডিফারেন্স অন্তত অর্ধ শতাব্দীর। গঙ্গায় আজ একটা ব্রিজ হবে, পঞ্চাশটা বছর জোড়া লাগবে।"

বলরাম হা হা শব্দে হেসে উঠলেন। তাঁর মনে হচ্ছে, এমনভাবে তিনি কলেজে পড়ার দিনগুলোর পর আজই প্রথম হাসলেন। হাসির সঙ্গে যেন শুকনো হয়ে যাওয়া বছরগুলো ঝরে ঝরে যাচ্ছে শরীর থেকে।

"মেয়েটি কি একা জলে নামবে?" বলরাম তারপর কথাটা শুধরে নিয়ে বললেন, "ওর সঙ্গে-সঙ্গে কারও থাকা দরকার।"

"ওর বাবা, দাদা, ওই তো দাঁড়িয়ে... ওরাও নামছে।" মনোজ আঙুল তুলে দেখাল। বছর চল্লিশের একটি লোকের সঙ্গে দশ-বারো বছরের একটি ছেলে। দু'জনে গায়ে সর্ষের তেল ঘষছে। "ব্যবসা করে, মুদির দোকান আছে। ওর স্ত্রী... মেয়েটার মা, সেও তো এই চার মাইল সাঁতারে নামত নিজের আগে পর্যন্ত।"

"আগে কেন, পরেও দু'বার নেমেছে।" মনোজের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পুরু চশমা চোখে লোকটি ভুল শুধরে দিল।

"বুঝলেন গড়গড়িদা, কম্পিটিশনের থেকেও বেশি, এটা একটা উৎসব। ভাটা এই আধঘণ্টা আগে শুরু হয়েছে, টানেই চার মাইল চলে যাবে। এবার আপনি জামা-প্যান্ট ছেড়ে ঝোলাটা আনুন দিন।"

"তুমি নৌকোয় থাকছ তো?"

"আমি বাসে কি অটোয় সামন্তপুর চলে যাব... আপনাকে আগেই।"

চৌত্রিশজন সাঁতারু আর চারটে নৌকোয় লাইফ সেভার ও ক্লাবকর্তারা। সাঁতারুদের মাথায় লাল কাপড়ের টুপি। এদের মধ্যে অনেকেই রাজ্য চ্যাম্পিয়ান। বাঁধাঘাটে জলের পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগীরা, কে সামনে থাকবে তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি চলছে। নৌকো থেকে হুইস্‌ল বাজল। একজন সাদা পতাকা তুলে দাঁড়িয়ে আবার হুইস্‌ল এবং পতাকা ধরা হাতটা নামাল। হইহই করে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সাঁতারুরা। সকলের শেষে নামলেন বলরাম।

॥ ৯ ॥

সামন্তপুর কালীতলা ঘাটে সকলের শেষে জল থেকে উঠলেন বলরাম। এবং উঠলেন দু' হাত তুলে বিজয়ীর মতো।

"কই, মনোজ কোথায়?"

মনোজ সামন্ত উত্তেজিতভাবে এগিয়ে এলেন। "গড়গড়ি আপনি যে ফিনিশ করবেন, সত্যি বলছি, ভাবিনি।"

"ভেবেছিলে ডুবে যাব, হাফ ছুটি পাবে? মাথা কাটা যাবে তো?"

"আজ রাতে গরিবের বাড়ি চাট্টি ডালভাত খেয়ে তবে বাড়ি ফিরবেন। স্কন্ধকাটা হইনি, কম আনন্দ হচ্ছে আমার!"

বলরাম হাসতে গিয়ে একটা কাঁটা ফোটার বেদনা অনুভব করলেন। আর-একদিন তিনি একজনকে অনেকটা এইভাবেই খাওয়ার কথা বলেছিলেন। সে রূঢ়ভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেছল।

"নিশ্চয় খাব। পেটপুরে খাব। কাল অফিস যদি না যাই—"

"যেতে হবে না, যেতে হবে না, আমি ম্যানেজ করে দেব। এবার থলিটা দিন। জামাপ্যান্ট পরে তারপর প্রাইজ নেওয়া।"

"আমার আবার প্রাইজ কী!" বলরাম অবাক হলেন। "লাস্টের আবার প্রাইজ হয় নাকি?"

"হয়, হয়, চলুন তো!" মনোজ সামন্ত টান দিলেন বিস্মিত বলরামের হাত ধরে।

ক্লাবঘরের সামনে খোলা জায়গায়, দুটো তক্তপোশ দিয়ে মঞ্চ হয়েছে। মাইক্রোফোন আর টেবল, নিয়াভরণ এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার দিলেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। এখানকারই একজন ডাক্তার। কাপ, মেডেল এবং তোয়ালে যারা পেল তারা সকলেই নিয়মিত সাঁতার কাটে এবং কুড়ির কম বয়সী।

"এবার পুরস্কার দেওয়া হবে প্রতিযোগিতার কনিষ্ঠতম সাঁতারু উমা পালকে। তার হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন প্রতিযোগিতার সব থেকে বয়স্ক সাঁতারু শ্রীযুক্ত বলরাম গড়গড়ি। প্রসঙ্গত জানাই দু'জনের বয়সের পার্থক্য পঞ্চাশ বছরের, এবং দু'জনেই সফলভাবে প্রতিযোগিতা শেষ করেছেন।" ক্লাব সচিবের ঘোষণা শেষ হওয়ামাত্র হাততালি আর চিৎকার উঠল। দু'জনকে কাছ থেকে দেখার জন্য মঞ্চের দিকে এগিয়ে এল জনতা। ঠেলাঠেলি শুরু হল।

বলরাম হকচকিয়ে গেলেন এত লোকের আগ্রহ, ঔৎসুক্য দেখে। তাঁকে দেখার জন্য নয়, আসলে ওই পঞ্চাশ বছরের পার্থক্যটাই যে এদের কৌতূহলী করে তুলেছে, সেটা তিনি বুঝতে পারছেন। তিনি নিজেও কিঞ্চিৎ উত্তেজনা বোধ করলেন। মনোজ সামন্ত প্রায় ঠেলতে-ঠেলতে বলরামকে মঞ্চের দিকে নিয়ে

গেলেন। টাক মাথা, বেঁটে লোকটিকে দেখে বাচ্চা দর্শকরা আবার হাততালি দিল। বলরামের চেয়ে উমা পাল উচ্চতায় মাত্র আধফুট ছোট।

প্রতিযোগিতায় ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে পঞ্চম পর্যন্ত যারা স্থান পেয়েছে তাদের একটি করে তোয়ালে দেওয়া হয়েছে। বাড়তি রয়েছে দুটি তোয়ালে। তারই একটি উমার হাতে দিয়ে বলরাম তাকে কোলে তুলে নিলেন। বাচ্চা মেয়েটি লজ্জায় তোয়ালেটা দিয়ে মুখ ঢাকল।

আবার ঘোষণা হল, "এবার উমা পাল পুরস্কার তুলে দেবে বলরাম গড়গড়ির হাতে।"

দু'হাত বাড়িয়ে উমার হাত থেকে একটা তিন হাত লম্বা হাতলুনের তোয়ালে নিলেন বলরাম। ইতোমধ্যে কেউ বলে দিয়েছিল উমাকে, তোয়ালেটা হাতে দিয়েই সে প্রণাম করল বলরামকে। প্রবল হর্ষধ্বনি আর করতালি বলরামের চোখে বাষ্প ঘনিয়ে তুলল।

সভাপতি ডাক্তারবাবু মাইকের সামনে এসে বললেন, "এবার বলরামবাবু আপনাদের দু-চার কথা বলবেন।"

বলরামের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। বক্তৃতা! ভাষণ! দু-চার কথা মানে? কিন্তু আমি কেন? তিনি অসহায়ভাবে সভাপতির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হাসতে-হাসতে ডাক্তারবাবু বললেন, "আজ আপনিই তো প্রধান। আমাদের এই চার মাইল সাঁতারে আজ পর্যন্ত আপনার বলী কেউ কম্পিট করেনি। আপনি বলবেন না তো কী, যে জীবনে সাঁতার কাটেনি, সেই আমি এখানে বাণী দেব? আমার কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই! আপনার যা মনে আসে তাই বলুন।"

সামনে থেকে মনোজ সামন্ত চেঁচিয়ে বলল, "গড়গড়িদা, ঘাবড়াবেন না। যা বলবেন আমরা শুনব।"

বলরাম মাইক্রোফোনের সামনে এলেন।

"একটা সময় ছিল যখন আমার বয়স তোমাদের মতোই ছিল।" বলরামের মুখ থেকে হঠাৎই বাক্যটি বেরিয়ে এল। যেটুকু কথাবার্তা দর্শকদের মধ্যে হচ্ছিল, বন্ধ হয়ে গেল।

"বাড়ির কাছেই ছিল গঙ্গা, সাঁতার কাটতাম। স্বপ্ন দেখতাম ইংলিশ চ্যানেল পার হচ্ছি। স্বপ্ন দেখতাম ওলিম্পিকে গোল্ড মেডেল গলায় পরছি। আমার দেশের জাতীয় সঙ্গীতের সুর বাজছে। তারপর যা হয়!" বলরাম থামলেন। একটু হাসলেন, "আমি সরকারি অফিসের একটা অপার ডিভিশন ক্লার্ক হলাম।

"আমার বয়স বাড়তে লাগল। বুড়ো বলতে যা বোঝায় কালক্রমে আমি সেই বয়সে প্রবেশ করলাম। কিন্তু বুড়ো তো দু'ভাবে হয়, শরীরে আর মনে। আমার শরীরের ক্ষয় অনিবার্য হয়েছে, কিন্তু যেভাবেই হোক মনের ক্ষয় আটকাবার কথা আমি ভাবলাম। আমি যেখানে থাকি সেই বিদ্যাসাগরে একটি মেয়েকে দেখেছি, সে কী প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারে! তাকে দেখেছি শুধুই মনের জোরে দশ কিলোমিটার রোজ রেসে প্রথম হতে।

"আমার মন বলল, বলরাম তুমি যা পারবে না কেন? বয়স হলেই কি ছোটদের কাছে হটে যেতে হবে? জুবুথুবু হয়ে সংসারের, সমাজের এককোণে পড়ে থাকবে? যৌবন চলে গেলেই কি জীবন শেষ হয়ে যাবে?"

বলরাম জানেন না তাঁর গলা চড়ে গেছে, তাঁর চোখের মণি বড় হয়ে উঠেছে। জীবনে এই প্রথম তাঁর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে তাঁর কানে ফিরে আসছে। এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও তাঁর হয়নি।

"কবে গঙ্গায় সাঁতার কেটে একটা কাপ জিতেছি, তাই ভাঙিয়ে আজীবন চলে না। বয়সকে কমানো যায় না, ধরেও রাখা যায় না, কিন্তু তাকে দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নেওয়া যায়।

"আমি অতি সাধারণ মানুষ। বৈজ্ঞানিক নই, শিল্পী নই, শিল্পপতিও নই, কিছুই নই। আমি তা হলে বয়স নিয়ে কী করতে পারি? পারি শুধু একটা কাজই— মন থেকে বয়সকে তুলে নিতে। সেই কাজটাই আজ করলাম। এই কাজ আবার করব, যতদিন পারব করে যাব।"

সেদিন রাতে শেয়ালদায়, রাস্তা থেকে ছ' টাকা দিয়ে বড় একটা ফুলকপি কিনে বলরাম ট্রেনে উঠলেন। বিমলাকে দুটো মিথ্যা কথা বললেন বাড়ি পৌঁছে।

"পনেরো টাকায় বিক্রি হচ্ছে দেখে তোয়ালেটা শেয়ালদায় কিনে ফেললাম। শস্তা হয়নি?.... আর এই কপিটা ধরো, মনোজের খেতের? তোমার জন্য দিল।"

॥ ১০ ॥

"আমায় ডেকেছেন জগন্নাথকাকা?"

বসার ঘরে খবরের কাগজ পড়ছিলেন জগন্নাথবাবু। কাগজটা নামিয়ে বললেন, "আয়, বোস।"

তুলসী মুখোমুখি সোফায় বসল।

"চাকরিবাকরির খোঁজ পেলি?"

"না। একজন বলল কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হতে, এটা জানলে আজকাল চাকরি পেতে নাকি সুবিধে হয়। গেছলাম একটা কম্পিউটার শেখানোর টিউটোরিয়ালে। এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে লাগবে পৌনে পাঁচশো টাকা আর মাসে মাসে আড়াইশো।" তুলসী মাথা নামিয়ে চুপ করে গিয়ে বুঝিয়ে দিল টাকাটা তার সাধ্যের বাইরে।

জগন্নাথবাবু কয়েক সেকেন্ড ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "এখানে সূর্য সঙ্ঘের দশ কিলোমিটার দৌড় কম্পিটিশনে তুই নাকি প্রথম হয়েছিস?"

"হ্যাঁ।"

"কই, সে-কথা আমায় বলিসনি তো? ক্লাবের সেক্রেটারি পূর্ণেন্দু কথায়-কথায় কাল আমায় বলল।"

"এ আর বলার মতো কিছু নাকি?" তুলসীর স্বর লাজুক। মনে-মনে বলল, বলে কোনও লাভ হবে না বলেই বলিনি।

"বলার মতো নয়! বলিস কি? দশ কিলোমিটার মানে ছ' মাইল। একটা গেরস্তবাড়ির মেয়ে এই ভাঙাচোরা রাস্তায়, পূর্ণেন্দু বলল নখ উঠে যাওয়ায় খালি পায়ে যন্ত্রণা নিয়ে দৌড়ে প্রথম হয়েছে! তার মানে ভীষণ কষ্ট সইবার ক্ষমতা আর জেতার ইচ্ছেটা তার আছে। এটা তো খুব বড় ব্যাপার। এটাই কি তোর প্রথম এই দৌড়ে নামা?"

"হ্যাঁ," বলেই তুলসী লজ্জায় কুঁকড়ে রইল। সেদিনের মিথ্যে কথাটা জগন্নাথকাকা এখনও মনে করে রেখে থাকলে তার সম্পর্কে কী ধারণা করছেন!

"আমাদের অফিসের স্পোর্ট্স কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশে আছে, চাকরি দিতে হবে। সেই স্পোর্ট্সে, যেটা ওলিম্পিকে আছে। সামনের ওলিম্পিকে একটা নতুন স্পোর্ট্স ইনক্লুডেড হয়েছে। এদেশে সেটা নেই বললেই চলে।" জগন্নাথবাবু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন।

"নাম কী স্পোর্ট্সটার?" কৌতূহলভরে তুলসী জিজ্ঞেস করল। ডাকিয়ে এনে জগন্নাথকাকা নতুন একটা স্পোর্ট্সের খবর দিচ্ছেন কেন?

"ট্রায়াথলন।"

জগন্নাথবাবু পিঠের থেকে বালিশটা কোলের ওপর এনে ঝুঁকে বসলেন। "পেন্টথলন, হেপ্টাথলন, ডেকাথলন শুনেছিস তো, সেইরকম এটা হল ট্রায়াথলন। তিনটে বিষয়ে স্পোর্ট্স পর-পর করতে হবে। প্রথমে সাঁতার, তারপর সাইক্লিং, তারপর দৌড়।"

জগন্নাথবাবু পিটপিট করে তাকিয়ে রইলেন তুলসীর মুখের দিকে। মুখে পাতলা রহস্যময় হাসি। হাসিটার অর্থ একটু-একটু করে তুলসীর কাছে পরিষ্কার হল যখন তার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল, শিরদাঁড়া বেয়ে গরম একটা ধারা নেমে এল।

"কাকাবাবু, আমি পারব। আমি ওই তিনটেই পারি।"

"আরে সেইজন্যই তো ডেকে পাঠিয়েছি। পূর্ণেন্দুর কাছে তোর কথা শুনেই আমার স্ট্রাইক করল। আমাদের কোটার চারটে মেয়ে তো নেওয়া হয়ে গেছে আচারিতে, একজন এখনও বাকি, তা হলে ট্রায়াথলনে নিলে কেমন হয়? একটা নতুন ব্যাপার হবে! আর আমার মনে পড়ল সেদিন তুই বলেছিলি, সাঁতার জানি, সাইক্লিং জানি। মনে আছে?"

তুলসী ঘাড় নাড়ল। পাঁচ মাইল দৌড়ে তার ফার্স্ট হওয়ার কথাটাও কি কাকাবাবুর মনে পড়েছিল? কিন্তু সে- সম্পর্কে কিছু তো বলছেন না!

"নতুন স্পোর্ট্স বোর্ডের কাছে চিঠি লিখে অ্যাপ্রুভাল আনাতে হবে। যাকে নেব, তাকে তো আগে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। ট্রায়াথলনের কোনও কম্পিটিশন বাংলায় হয় কি না আগে সেটার খোঁজ করি। যদি হয় তা হলে তাতে নেমে তোকে ফার্স্ট প্লেস পেতে হবে। তারপর তোর নাম বোর্ডের কাছে পাঠাব। ব্যাপারটা বুঝলি?"

তুলসী ঘাড় নাড়ল। সে বুঝেছে বন্ধ দরজাটা একটু ফাঁক হয়েছে। সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে অস্পষ্টভাবে একটা চাকরি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওটা তো অনেক দূরের ব্যাপার, তার আগে কাছের ব্যাপারটা তাকে জেনে নিতে হবে।

"কাকাবাবু তিনটে বিষয় পর পর কম্পিট করতে হবে বললেন। কিন্তু কোন বিষয় কতটা করে করতে হবে?"

জগন্নাথবাবুকে এবার সামান্য বিব্রত দেখাল। "ব্যাপারটা আমার কাছেও নতুন, ডিটেইলে কিছুই জানি না। শুনেছিলাম মাদ্রাজে নাকি ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ানশিপ হয়েছে। আমি কালই খোঁজ নেব, তুই তিন-চারদিন পরে এসে জেনে যাস। তবে এটা জানি, সাঁতার, সাইক্লিং আর দৌড় পর-পর তিনটে করতে হবে। তোর তো সাইকেল আছে।"

"আছে, তবে বড্ড পুরনো, বাবা কিনেছিলেন। ওটার অনেক কিছুই পালটাতে হবে।"

"তা হলে পালটে নে। প্র্যাকটিস তো করতে হবে, আর যত শিগ্‌গির শুরু করা যায় ততই ভাল।"

জগন্নাথবাবুর বাড়ি থেকে তুলসী যখন বেরোল তখন বলরামবাবু ধাক্কাধাক্কি করতে-করতে বিদ্যানগর স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলেন। তাঁর হাতে 'স্পোর্ট্সটাইম' নামে একটি ইংরেজি খেলার পত্রিকা। খবরের কাগজের খেলার পাতাটি খুঁটিয়ে পড়েন কিন্তু খেলার পত্রিকা তিনি কেনেন না, এটিও কেনেননি। পেয়ে গেছেন।

বাড়ি ফেরার জন্য বিধাননগর স্টেশনে বলরাম চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর একটি ট্রেন এল। এত ভিড় যে কামরার দরজা দিয়ে মানুষ উপচে বেরিয়ে রয়েছে। প্ল্যাটফর্মে যারা অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজায়। সেই ঝাঁপানোদের মধ্যে বলরাম নিজেকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন এবং মুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে পিছিয়ে আসেন।

ট্রেনটি যখন ছাড়ল তখনও কেউ-কেউ ওঠার জন্য মরিয়া হয়ে ট্রেনের সঙ্গে ছুটল। বলরাম চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া ট্রেনটির দিকে যখন হতাশ চোখে তাকিয়ে, তখন একটি লোক যেতে-যেতে থেমে গিয়ে, তাঁর পায়ের কাছ থেকে একটি রঙিন মলাটের পত্রিকা কুড়িয়ে তুলে নিয়ে বলল, "আপনার ম্যাগাজিনটা পড়ে গেছে।"

বলরাম তার হাত থেকে পত্রিকাটা নেওয়ামাত্র লোকটি ব্যস্তভাবে চলে গেল। বলরাম তখন বলতে চেয়েছিলেন, এটা

আমার নয়, ট্রেনে ওঠার সময় কারও হাত থেকে পড়ে গেছে। কিন্তু বলার সুযোগই পেলেন না। মলাটে স্টেফি গ্রাফ আর মোনিকা সেলেস-এর ছবি, প্রকাশের তারিখ, চার মাস আগের। 'পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা' গোছের একটা মনোভাব হল বলরামের। আমি না পেলে আমার বদলে অন্য কেউ পেত, ব্যাপারটা তো একই হত। রাত্রে এটা পড়ব স্থির করে পত্রিকাটা ঝুলিতে রেখে তিনি পরের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

বিদ্যানগর স্টেশন থেকে বেরিয়ে স্টেশন রোডে কলাওলার কাছাকাছি হয়েছেন তখন বলরাম শুনলেন তুলসীর গলা। "মেসোমশাই, রানিসায়রে আর সাঁতার কাটতে যান না যে?"

অস্বস্তি বোধ করলেন। না যাওয়ার কারণটা এতদিন পর না বলাই ভাল। তুলসীর চোখের এবং কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতা থেকে তিনি বুঝলেন মেয়েটি মনে করে রাখেনি রূঢ়ভাবে তাঁর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের কথা।

"ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয়েছিল।"

"তা হলে কলা খাবেন না।"

"না, না, এখন একদম সেরে গেছে। ভাবছি কাল থেকে আবার যাব।" সবুজ সিঙ্গাপুরি কলার একটা ছড়া তুলে বলরাম তাঁর ঝুলিতে ভরতে যাচ্ছেন তখন তুলসী হাত বাড়িয়ে বলল, "আমার একটা।"

"একটা নয়, দুটো।" বলরাম দুটো কলা ছিঁড়লেন ছড়া থেকে। "সাইকেলে কোথায় গেছলে?"

"ওপারে জগন্নাথকাকার কাছে। আমিও ভাবছি কাল থেকে জলে নামব। সাইকেলটাও সারাতে হবে। মনে হচ্ছে ভালই খরচ পড়বে।"

তুলসী একহাতে কলা খাচ্ছে অন্য হাতে ধরা সাইকেল—এইভাবে সে বলরামের পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল। রাস্তার ভিড়ের অংশটুকু পেরিয়ে আসার পর বলল, "আপনার চেনাজানা কেউ আছে যে টেপরেকর্ডার কিনবে?"

"কেন। তুমি কি বিক্রি করবে?"

"হ্যাঁ। দশ কিলোমিটারে প্রাইজ পেয়েছিলাম। আমি ওটা দিয়ে কী করব বলুন? গান শুনতে হলে তো ক্যাসেট কিনতে হবে, তার মানে খরচ।" আপনার জানাশোনাদের মধ্যে যদি কেউ থাকে তো বলবেন, কেমন? একদমই নতুন, পাশের বাড়ি থেকে ক্যাসেট এনে শুধু দু-তিনবার চালিয়েছি। নতুনের থেকে কমেই দেব।"

"তোমার কি খুব টাকার দরকার?"

"হ্যাঁ, সাইকেলটা সারাব। আমাকে ট্রায়াথলনে নামতে হবে।"

"কী বলনে?" বলরাম ঝুঁকে কানটা তুলসীর দিকে এগিয়ে দিলেন।"

"নতুন একটা স্পোর্টস। ট্রা-য়া-থ্-ল-ন। প্রথমে সাঁতার, তারপর সাইকেল, তারপর দৌড়, পর-পর, মাঝে থামাথামি নেই।"

"সে কী! এ তো খুব কষ্টকর ব্যাপার।"

তুলসীর মুখে আত্মপ্রসাদ ফুটে উঠল, "তা তো বটেই। কষ্ট না করলে আর স্পোর্টস কিসের?"

"তোমার পায়ের নখের অবস্থা এখন কেমন?"

"নতুন নখ উঠছে, ব্যথাটাথা নেই।"

"তা এই ট্রায়াথলনে কোথায় নামবে? কবে হবে?"

"কিছুই জানি না। কতটা দৌড়তে হবে, কতটা সাঁতার কাটতে হবে তাও জানি না। আজই তো জগন্নাথকাকার কাছে প্রথম শুনলাম। উনি খোঁজখবর নিয়ে আমায় জানাবেন বললেন।" তুলসী দাঁড়িয়ে পড়ল, "মেসোমশাই, এবার আমি যাব। টেপরেকর্ডারের কথাটা মনে রাখবেন।"

"হ্যাঁ মনে থাকবে।"

প্যাডেলে পা রেখে উঠতে গিয়েও তুলসী উঠল না একটা কথা বলার জন্য। "জগন্নাথকাকা বললেন একটা চাকরি হতে পারে যদি ট্রায়াথলনে ফার্স্ট হতে পারি।"

তুলসী সাইকেলে উঠে প্যাডেল শুরু করল।

॥ ১১ ॥

রাত্রের খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে টেবল ল্যাম্প জ্বেলে বলরাম খবরের কাগজ পড়েন। পাতাগুলোয় চোখ বুলিয়ে পড়ার মতো কিছু না পেয়ে স্পোর্টসটাইম পত্রিকাটা তুলে ছবি দেখতে লাগলেন। দেখতে-দেখতে শেষের দিকে এসে পেলেন একটি লেখা এবং তার সঙ্গে চারটি ছবি। প্রথম ছবিতে : একটি কিশোরী সমুদ্রতীরে বালির ওপর দৌড়চ্ছে। পরনে কালো জামা, লাল শর্টস, কেডস, পিঠের ওপর বেণী, বাঁ হাতে ঘড়ি এবং নাকে নাকছাবি। মুখের গড়ন অনেকটাই তুলসীর মতো।

আর-একটি ছবিতে : মেয়েটি একটি রেসিং সাইকেল চালাচ্ছে সমুদ্রতীরের একটি রাস্তায়। তার পেছনে একটি বালক হাসতে হাসতে দৌড়চ্ছে।

আর-একটি ছবিতে : মেয়েটি কস্টিউম পরা, মাথায় আঁট করে বসানো রবারের টুপি। সমুদ্রের কিনারে দাঁড়িয়ে।

আর-একটি ছবিতে : ক্যারমবোর্ড ঘিরে মেঝেয় দু'জন বসে। ছবিতে বোঝা যায় এরা একটি পরিবার, স্বামী-স্ত্রী, দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। আগের ছবিগুলির মেয়েটিও এর মধ্যে রয়েছে।

বলরাম একটু কৌতূহল বোধ করলেন প্রথম তিনটি ছবির জন্য। একটি মেয়ে তিনটি খেলায়। হয়তো সাঁতারই, দৌড় আর সাইক্লিংটা বোধ হয় সাঁতারের ট্রেনিংয়েরই অঙ্গ। পাতা উলটে যাওয়ার আগে লেখার শুরুতে মোটা অক্ষরে কয়েক লাইনের ভূমিকাটা তিনি পড়তে শুরু করলেন।

"ইন অ্যান এরা হয়্যার সাকসেস ইন ইন্ডিয়ান স্পোর্ট ইজ অলমোস্ট নন-এগজিসটান্ট, সেভেনটিন-ইয়ার-ওল্ড সি. আমুদা হাজ ওন দ্য এশিয়ান জুনিয়ার ট্রায়াথলন চ্যাম্পিয়নশিপ ইন চায়না রিসেন্টলি। হোয়াট মেকস হার অ্যাচিভমেন্ট অল দ্য মোর কমান্ডেবল ইজ দ্যাট শি কামস ফ্রম অ্যান আন্ডারপ্রিভিলেজড ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড হ্যাড টু স্ট্রাগল এগেন্স্ট রিয়েল অডস টু ট্রায়াম্ফ।"

বলরামের হাত দুটো একবার কেঁপে উঠল। চোখ বন্ধ করে উত্তেজনা কমানোর জন্য সময় নিলেন। একেই কি বলে জ্যাকপট পাওয়া : মেঘ না চাইতেই জল। এই ট্রায়াথলনের কথাই তো আজ তুলসী বলল। তিনি পত্রিকাটা চোখের আরও কাছে নিয়ে এলেন।

"হার ফাদার ওয়াজ আ 'হেল্পার' ইন দ্য আন্না সুইমিং পুল ইন ম্যাড্রাস। হার মাদার কুসুমা স্টিল সেলস সুগারকেন জুস ফ্রম এ পুশ কার্ট অন মেরিনা বীচ। দ্য ফ্যামিলি অব টু ডটারস অ্যান্ড টু সনস, বিলংগড টু দ্য ফিশারমেন কমিউনিটি। দে লিভড ইন আ স্মল হাট ইন ট্রিপলিকেন ...

"দ্য ফাদারস ইনকাম ওয়াজ পুয়োর। ফুড ওয়াজ নট আ রেগুলার অকারেন্স। ইট ওয়াজ দ্য টিপিক্যাল ইন্ডিয়ান স্টোরি অব আ লাইফ স্টিপড্ ইন পভার্টি অ্যান্ড আনসারটেনিটি। বাট দ্য গার্ল আমুদা ওয়াজ পজেজড অব হাই স্পিরিট্স। ডেস্পাইট দ্য ল্যাক অব ফুড ..."

বলরাম বিছানায় উঠে বসলেন। প্রোগ্রামে রচনাটি প্রথমবার প্রায় গিলে ফেললেন। তারপর আবার পড়তে শুরু করলেন ধীরে-ধীরে। সেই জায়গাটা তিনি দু'বার-তিনবার পড়লেন যেখানে আমুদা চিনের তিয়ানজিনে তার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান হওয়ার কথা বলেছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

চিনে রওনা হওয়ার আগে আমুদাকে কে যেন বলেছিল, "হয় মেডেল নিয়ে ফিরবি নয়তো ওখানেই মরবি।" তাই সে ঠিক করেছিল মরতে হয় তো মরব কিন্তু শেষ একটা চেষ্টা করে যাব। তিয়ানজিন সামার লেক-এ দেড় কিলোমিটার সাঁতার শেষে আমুদা রইল তৃতীয় স্থানে। তারপর চল্লিশ কিলোমিটার সাইক্লিং শেষে সে আরও পিছিয়ে গিয়ে রইল অষ্টম স্থানে। এর পর শুরু হল দশ কিলোমিটারের দৌড়। ওর সামনে সাতটি মেয়ে দৌড়চ্ছে। অনেক পিছিয়ে আমুদা।

বলরামের মনে হল তখন এই মেয়েটার নিশ্চয়ই মনে পড়ছিল, "মরতে হয় তো মরব কিন্তু শেষ একটা চেষ্টা করে যাব।" হল না ছেড়ে আমুদা দৌড়তে থাকে। পাঁচ কিলোমিটার দৌড় যখন সম্পূর্ণ হল তখন সে ছ'জনকে অতিক্রম করে গেছে। তবুও অনেকদূরে এগিয়ে রয়েছে লিন ইয়েন নামে চিনা মেয়েটি। ইয়েন সাঁতারে ও সাইক্লিংয়ে প্রথম হয়েছে। আমুদা তখন, কে প্রথম হয়েছে-না-হয়েছে মনে করে রাখেনি। নিশ্চয় তখন তার দৃষ্টিতে সামনের চিনা মেয়েটি ছাড়া বিশ্বচরাচর আর কিছু ছিল না। গতি, গতি, গতি, সে শুধু গতি বাড়িয়ে গেছে। আট কিলোমিটারের মাথায় আমুদা ধরে ফেলল ইয়েনকে। তারপর সে আরও গতি বাড়াল। যখন আমুদা টেপ ছিঁড়ল তখন সে নিঃশেষিত। শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতাটুকুও আর তার নেই। অজ্ঞান হয়ে সে লুটিয়ে পড়ল। সে জানে না ইয়েনকে শেষপর্যন্ত হারাতে পেরেছে কি না। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দু' ঘণ্টা পর আমুদার জ্ঞান ফিরে আসতেই সে দেখল তার দিকে তাক করা ক্যামেরার আলো জ্বলসে উঠছে। আমুদা ভাবল, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে কাগজের ফোটোগ্রাফাররা তার ছবি তুলছে। "কনগ্র্যাচুলেশনস, আমুদা, তুমিই জিতেছ।" এই কথা শোনার পর মেয়েটির মনের অবস্থা কীরকম হয়েছিল?

অনেকক্ষণ পত্রিকাটার খোলা পাতার দিকে তাকিয়ে বলরাম আনমনার মতো বসে রইলেন। একসময় তাঁর চোখ ভিজে এল। বাড়ি থেকে, দেশ থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরে বিভুঁয়ে, কী লড়াইটাই না করে এল আধপেটা খাওয়া এই গরিবঘরের মেয়েটি!

বলরাম পত্রিকাটি আবার তুলে নিয়ে ভূমিকাটা মনে-মনে তর্জমা করলেন। যে আমলে ভারতীয় খেলাধুলোয় সাফল্যের কোনও অস্তিত্বই নেই, তখন সতেরো বছরের আমুদা চিন থেকে জিতে এল এশিয়ান খেতাব। তার এই সাফল্য আরও বেশি সমীহ জাগায় এইজন্যই যে, সে উঠে এসেছে সুযোগসুবিধে না পাওয়া পটভূমি থেকে, বিজয়ী হওয়ার জন্য সত্যিকারের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাকে লড়াই করতে হয়েছে।

দিনের আলো ফোটার আগেই বলরাম সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তুলসীদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যখন "তুলসী, তুলসী" বলে চেঁচিয়ে ডাকলেন তখনও কুলডাঙা গ্রামের ঘুম ভাঙেনি। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তুলসীর মা। বলরামকে দেখে তো তিনি অবাক!

"এত ভোরে, আপনি!"

বলরাম একটু উত্তেজিত স্বরে বললেন, "তুলসী একটা ব্যাপার জানার জন্য খোঁজ করছিল, আমি সেটা পেয়ে গেছি বউদি!" সাইকেলে হ্যান্ডেলে ঝোলানো ঝুলিটা থেকে তিনি স্পোর্টসটাইম পত্রিকাটি বের করলেন। "ওকে একটু ডেকে দেবেন?"

একটু পরেই ঘুমজড়ানো চোখে তুলসী বেরিয়ে এল। কুণ্ঠিতভাবে সে বলল, "মেসোমশাই, জানেনই তো কেউ এলে ঘরে বসানোর জায়গা নেই।"

"আরে, বসার জন্য আমি আসিনি। এই লেখাটা পড়ানোর জন্য এসেছি। পড়ে ন্যাখো ট্রায়াথলন কী, তা তুমি জানতে পারবে।

বলেছিলে না কতটা দৌড়তে হবে, কতটা সাঁতার কাটতে হবে, কতটা সাইকেল চালাতে হবে তা তুমি জানো না। সব এতে পাবে, আর পাবে একটা মেয়ের কথা।"

"কিন্তু মেসোমশাই—" পত্রিকাটা হাতে নিয়ে তুলসী ইতস্তত করল।

"দেড় কিলোমিটার সাঁতারের পর চল্লিশ কিলোমিটার সাইকেল তারপর দশ কিলোমিটার দৌড়, এর মধ্যে কিন্তুর কী আছে? তুমি তো সেদিনই দশ কিলোমিটার দৌড়লে। রানিসায়রের একবার এপার-ওপার করলেই দেড় কিলোমিটার হয়ে যাবে আর সেটা তুমি পারো। বাকি রইল চল্লিশ কিলোমিটার সাইকেলে। হ্যাঁ, এতটা তোমার অভ্যাস নেই। এটা তোমায় রেগুলার প্র্যাকটিস করতে হবে।"

"কিন্তু মেসোমশাই—।"

"এতে আর একটা জিনিস পাবে।" তুলসীর কথা গ্রাহ্যে না এনে, হাত থেকে পত্রিকাটি টেনে নিয়ে বলরাম পাতা উলটিয়ে বললেন, "আমুদা, মানে যে মেয়েটির কথা এতে আছে, সে রোজ কীরকম প্র্যাকটিস করে তা এখানে লেখা আছে। শোনো, ভোর সাড়ে চারটেয় সে সাইকেল নিয়ে দেড়ঘণ্টা চালায়, তারপর দৌড়য় একঘণ্টা। বাড়ি এসে সে স্কুলে যায়। সওয়া আটটা থেকে দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত স্কুল। বাড়ি ফিরে সামান্য কিছু খেয়ে সে সুইমিং পুলে গিয়ে তিন ঘণ্টা সাঁতার কাটে। বাড়ি ফিরে একটু পড়াশুনো, তারপরই শুয়ে পড়া।"

"কিন্তু মেসোমশাই, এই পত্রিকাটা যে ইংরেজিতে লেখা।" অবশেষে তুলসী তার বাক্যটি সম্পূর্ণ বলতে পারল।

"কিন্তু তুমি তো উচ্চ মাধ্যমিক পাশ।"

"তা হলেই কি ইংরেজি পড়ে মানে বুঝতে পারব? পড়ার বইয়ের বাইরে তো পড়েছি শুধু নোটবই!"

বলরামকে অপ্রতিভ দেখাল। "তা বটে, তা বটে। তা হলে বাবাকে ধরো। ওঁকে দিয়ে মানে করে নিয়ো। মোটকথা, এটা তোমায় পড়তেই হবে।"

বাড়ি থেকে বাবু বেরিয়ে এসে বলল, "মা চা কচ্ছে, মেসোমশাই খেয়ে যাবেন।"

"অবশ্যই। আজ আর ইচ্ছে করছে না, কাল থেকে রানিসায়রে যাব। আর তুলসী তুমিও কাল থেকে লেগে পড়ো। ভোরে সাইকেল নিয়ে—" বলরাম থেমে গেলেন তুলসীর মুখভাব দেখে।

"সাইকেলটা না সারিয়ে, চল্লিশ কিলোমিটার, মানে চব্বিশ মাইল, ওটা দিয়ে চালানো সম্ভব নয়।"

বলরামের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। খুব দ্রুত কী যেন ভেবে নিলেন।

"টেপরেকর্ডারটা কোথায়, বাড়িতে আছে?"

"হ্যাঁ।"

"ওটা নিয়ে যাব। মনে হয় খদ্দের একজন আছে।"

তুলসী বাড়ি থেকে টেপরেকর্ডার ভরা বাক্সটা আনল আর বাবু আনল কাপে ভরা চা।

বলরাম চা খেয়ে সাইকেলে ওঠার সময় বললেন, "জগন্নাথকাকার কাছে আজকালের মধ্যেই যেয়ো। ট্রায়াথলন কোথাও হচ্ছে কিনা জানার জন্য আমিও খোঁজ নেব।"

বাড়ি পৌঁছে বলরাম টেপরেকর্ডারটা বিমলার হাতে দিয়ে বললেন, "তোমার জন্য আনলাম। খুব শস্তায়, মাত্রা আড়াইশো টাকায় পেয়েছি। তুমি তো নাটক শুনতে ভালবাস, কালই সিরাজদ্দৌল্লার ক্যাসেট এনে নেব।"

অফিসে তিনি মনোজ সামন্তর কাছে খোঁজ নিলেন। "ট্রায়াথলন ব্যাপারটা কী তুমি জানো! এখানে কোনও ক্লাব আছে কি?"

মনোজ জানালেন জীবনে এই প্রথম শব্দটা শুনলেন। "তবে দোতলায় বিল্ডিং সেকশনের সমরেশবাবু ক্লাব-ট্লাব করেন, উনি হয়তো জানতে পারেন।"

একসময় বলরাম দোতলায় বিল্ডিং সেকশনে গিয়ে সমরেশবাবুকে ধরলেন। "আপনি তো খেলাধুলোর লাইনে আছেন, বলতে পারেন ট্রায়াথলনের কোনও ক্লাব এখানে আছে কি না বা কম্পিটিশন হয় কি না?"

সমরেশবাবু তখন খুবই ব্যস্ত অফিস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের দু'জন কর্তার সঙ্গে আলোচনায়। খুব সংক্ষেপে তিনি বলরামকে জানালেন, "ক্লাব আছে কি না বলতে পারব না, তবে একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে, স্টেট চ্যাম্পিয়ানশিপও নাকি করেছে। ওদের অফিস বোধ হয় বিডন স্ট্রিটে। এর বেশি কিছু জানি না।"

বলরাম চেয়ারে ফিরে আসতেই মনোজ সামন্ত জিজ্ঞেস করলেন, "খোঁজ পেলেন?"

"শুধু বললেন বিডন স্ট্রিটে নাকি অ্যাসোসিয়েশন আছে।"

"আচ্ছা আমি সামন্তপুরে আমাদের ক্লাবে খোঁজ নেব। আমাদের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার পাত্র খেলাটেলার খুব খবর রাখেন, বইটইও পড়েন, ওঁকেই বরং জিজ্ঞেস করব।"

"আর একটা কথা জানার আছে সামন্ত। একটা টেপ রেকর্ডারের দাম কত পড়বে বলতে পারো?"

"নানা দামের আছে। আটশো, হাজার, দেড় হাজার, দু' হাজার... কিনবেন তো? তা হলে একটু বেশি দামেরটাই—"।

"আরে না না, কিনব না। একজন বেচবে। এই মোটা একটা বইয়ের মতো দেখতে, বোধ হয় শস্তা দামেরই হবে। শ' পাঁচেক টাকা চাইলে অন্যায় হবে না, ব্র্যান্ড নিউ। কী বলো?"

পরদিন সকালে তুলসীদের বাড়িতে গিয়ে বলরাম পাঁচটি একশো টাকার নোট তাকে দিলেন।

"যে কিনল এর বেশি দেওয়ার সামর্থ্য তার নেই।" কুণ্ঠিত স্বরে তিনি বললেন। "আমি প্রথমে আটশো টাকা চেয়েছিলাম।"

"কী উপকার যে করলেন! রেকর্ডারটা তো টাকা দিয়ে কিনিনি, এর থেকে যা পাওয়া যায় তাই লাভ। সাইকেলটা এবার সারাতে পারব।"

"রানিসায়রে যাবে নাকি?"

"যাব, আপনি এগোন।"

দু'দিন পর মনোজ সামন্তের সঙ্গে বলরামের দেখা হল অফিসে ঢোকার মুখে।

"এই যে গড়গড়িদা, ডাক্তারবাবুকে ট্রায়াথলনের কথা জিজ্ঞেস করেছি। আপনি খোঁজ করছেন শুনেই তো উনি রীতিমত তেতে উঠলেন।"

"তেতে ওঠার কারণ?" বলরাম হালকা চালে বললেন।

"ওই যে সেদিন আমাদের ওখানে বলে এলেন 'এই কাজ আবার করব, যতদিন পারব করে যাব,' এটাই ডাক্তারবাবুকে ভীষণ নাড়া দিয়েছে। ওঁর বাড়িতে আজই সকালে গেছলাম। চেম্বারে যাবেন বলে বেরোচ্ছিলেন, যাওয়া বন্ধ রেখে বসে পড়লেন। বললেন, বলরামবাবুর নামা উচিত ট্রায়াথলনে। ওঁর মতো লোকেরাই পারবে। পড়াশুনো করা লোক তো, ট্রায়াথলন শুরুর ইতিহাসই বলে দিলেন। ভাবতে পারেন, উনিশশো আটাত্তর সালে, তার মানে মাত্র ক' বছর আগে হাওয়াইয়ে এই স্পোর্টসটার জন্ম দিয়েছে নেভির দুটি লোক। চলুন ভেতরে যাই, টেবলে না বসলে এসব কথা গুছিয়ে বলা যায় না।"

চেয়ারে বসেও মনোজ সামন্ত গুছিয়ে বলতে পারলেন না। "বুঝলেন দাদা, অতসব কথা মনে থাকে না। আমি বরং দু-চারটে পয়েন্ট লিখে নিয়ে আসব। তবে ওই দুটো লোক নিজেদের মধ্যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল এই বলে যে, শরীরের সবক'টা প্রধান-প্রধান

মাসলসের ক্ষমতা আর সহনশক্তি কার কত বেশি তার একটা পরীক্ষা শুরু হয়ে যাক। আর সেই পরীক্ষার জন্য ওরা ঠিক করে—"

"দেড় কিলোমিটার সাঁতার, চল্লিশ কিলো—"

"আরে না না গড়গড়িদা, এসব তো নস্যি। কত দূরত্ব দিয়ে ট্রায়াথলনের শুরুটা হয়েছিল জানেন? ... সমুদ্রে আড়াই মাইল সাঁতার, একশো বারো মাইল সাইকেল রেস আর তারপর পুরো ম্যারাথন দৌড় অর্থাৎ ছাব্বিশ মাইল তিনশো পঁচাশি গজ। বাপস। শুনেই তো আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছল। এই ভাবে শরীরের ক্ষমতার পরীক্ষা মানুষে দিতে পারে। এর নাম হল আয়রনম্যান ট্রায়াথলন। আপনি যেটার কথা বলছেন তার নাম টিনম্যান ট্রায়াথলন।"

"আয়রনই হোক আর টিনই হোক, লোকে তো স্বেচ্ছায় পরীক্ষা দিতে কম্পিটিশনে নামছে।" বলরাম গম্ভীর স্বরে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেন।

"নামছে বলে নামছে!" মনোজের দুই চোখের মণি বিস্ফারিত হল। "শ'য়ে-শ'য়ে ট্রায়াথলন বছরে হচ্ছে পৃথিবীর বহু দেশে আর আমরাই এ-সম্পর্কে কিছু জানি না। আর লোক বলতে শুধু কি পুরুষ? মেয়েরাও আয়রনম্যানে নামছে। কোথায় পড়ে আছি আমরা!" মনোজ মাথা নেড়ে আক্ষেপের সঙ্গে চুকচুক ধরনের একটা শব্দ মুখ দিয়ে বের করলেন।

"বলরাম সান্ত্বনা দেওয়ার মত করে বললেন,"আমাদের দেশে শুরু হোক, দেখবে প্রচুর ছেলেমেয়ে নামবে। দুঃখ হয় কী জানো, এসব স্পোর্টস আমাদের অল্পবয়সে ছিল না।"

"ছিল না তো কী হয়েছে, এখন তো হয়েছে। আপনি নামুন।"

"আমি নামব? বলরাম হেসে উঠতে গিয়েও হাসলেন না। শুধু মাথা নাড়লেন, "এত কঠিন পরীক্ষা এই বয়সে শরীর দিতে পারবে না।"

মনোজের মুখ এবার হাসিতে উদ্ভাসিত হল। "পারবে না বলছেন? তা হলে এই বছরেরই গোড়ায় মাদ্রাজে যে ন্যাশনাল ট্রায়াথলন চ্যাম্পিয়ানশিপ হল, তার সঙ্গেই হল এশিয়ান কাপ সিরিজের প্রথম দফার কম্পিটিশন। তাতে নেমেছিলেন জাপান ট্রায়াথলন ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। তাঁর বয়স কত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

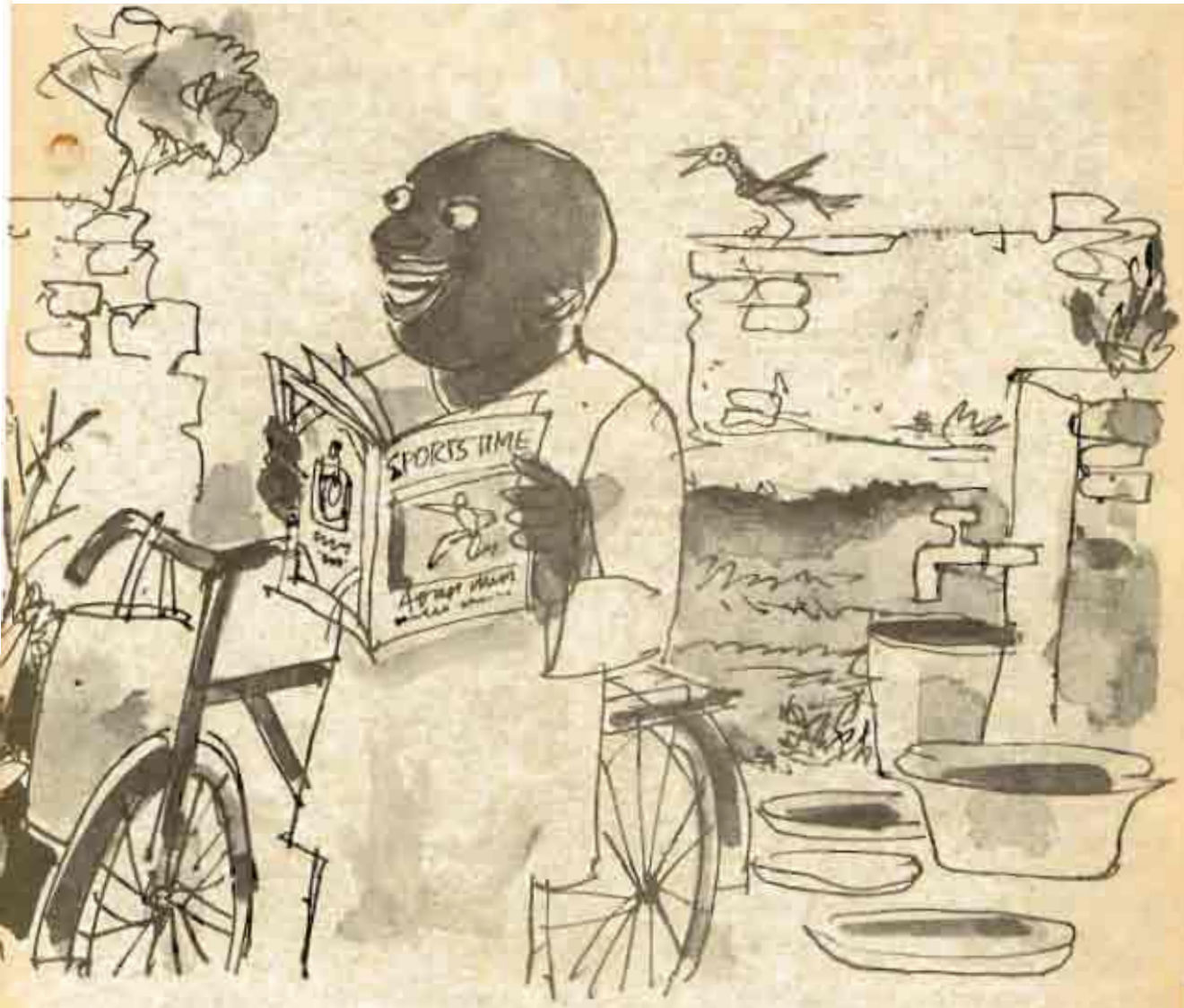

জানেন ?" মনোজ একটা নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করলেন। "বলুন, কত হতে পারে ?"

বলরাম বুঝলেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মশাই অবশ্যই বয়স্ক, নয়তো মনোজ রহস্যময় করে তুলত না প্রশ্নটাকে। "কত হবে বলব কী করে, এই ধরো পঞ্চাশ-বাহান্ন।" বলরাম যথাসাধ্য বাড়িয়েই বললেন।

"বাহাত্তর।"

বলরামের বিস্ময়ে কোনও ভেজাল নেই। তিনি শুধু "অ্যাঁ" বলে তাকিয়ে রইলেন।

"অ্যাঁ নয়, সত্যিই। বুড়ো পুরো ফিনিশ করেছে, তবে সবার শেষে।" মনোজের গলায় প্রচ্ছন্ন একটা শ্রদ্ধা। বলরাম আবিষ্কার করলেন জাপানি বাহাত্তর বছরের জন্য।

"এই যে পঞ্চাশ-বাহান্ন বললেন, আমেরিকার একটি লোক তাঁর বাহান্নতম জন্মদিনের বছরটা পালন করেছেন কীভাবে জানেন ?" মনোজ উত্তেজিত দৃষ্টিতে বলরামের দিকে তাকিয়ে রইলেন উত্তরের জন্য।

"আমি কী করে জানব ? ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তো আমার কথা হয়নি।"

"বাহান্নটা ট্রায়াথলনে কম্পিট করে। তার মানে হন্তায় একটা করে। চোখ বুজে ব্যাপারটা ভাবুন তো। আমরা পারব ?"

"লোকটাকে কি লোকাল ট্রেনে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কেরানির চাকরি করতে হয় ?"

মনোজ থতমত হয়ে আমতা-আমতা করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, সুযোগ না দিয়ে বলরাম বললেন, "সবসময় ওই ডিভেলাপড কান্ট্রির লোকেদের সঙ্গে আমাদের মতো পিছিয়ে থাকা গরিব দেশের তুলনা কোরো না। নিজেদের ছোট চোখে দেখা উচিত নয়।"

বলরামের চাহনিতে এমন কিছু একটা রয়েছে, যেটা মনোজের মাথা নত করে দিল। টেবলের ড্রয়ার খুলে তিনি কলম, পিন কুশন, পেপার ওয়েট ইত্যাদি বের করে টেবলে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

"মনোজ, কোথাও যদি ট্রায়াথলন হয় আমি নামব। কথাটা কিন্তু এখন কাউকে বোলো না, তবে ডাক্তারবাবুকে জানিয়ে দিয়ো।"

বলরাম তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা বিমলাকেও জানাননি। তুলসীকেও নয়।

॥ ১২ ॥

স্পোর্ট্‌সটাইম পত্রিকাটি নামিয়ে রেখে জগন্নাথবাবু বললেন, "এতে তো যা জানার তা সবই রয়েছে। তুই ভাল করে তা হলে প্র্যাকটিস শুরু কর।"

"শুরু মোটামুটি করছি। সাইকেলটা মেরামত করতে দিয়েছি ওপারে জটাধারী রিপেয়ারিং শপে। কাল-পরশু দেবে। ভোরে এখন সাইকেলের বদলে দৌড়চ্ছি। আমাদের ভেতর দিকে চালতাতলা, রাইহাটা, দেবীপুর যাওয়ার রাস্তাটা পাকা, ভাঙাচোরা নয়। ওটা ধরে গত দু'দিন একঘণ্টা দৌড়ে এসে, জলে নেমে দু'বার রানিসায়রটা এপার-ওপার করেছি।" যেন অনুমোদন চায় এমনভাবে তুলসী তাকিয়ে রইল জগন্নাথবাবুর দিকে। তিনি মাথা নেড়ে বোঝালেন সন্তুষ্ট হয়েছেন।

"তবে সাইকেলটা পেলে আগে সাইকেল তারপর দৌড়, যেভাবে আমুদা করে। আর বিকেলে সাঁতার। সকালে দৌড়বার আগে কিছু খেয়ে নিস। খালি পেটে দৌড়বি না, ভেজানো ছোলা বা বাদাম খাবি।"

তুলসী মাথা নাড়ল।

"খবর নিয়েছি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ট্রায়াথলনের স্টেট চ্যাম্পিয়ানশিপ হবে। এন্ট্রি ফর্ম আনাবার ব্যবস্থা করে রেখেছি, বিডন স্ট্রিটে আমাদের অফিসের একটা ছেলে থাকে। তুই এখন বাড়ি যাবি কী করে, সাইকেলটা তো নেই।"

"হাঁটব। বিদ্যানগর ছাড়ালেই তো অন্ধকার, তখন ছুটব।"

জগন্নাথবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে তুলসী এল জটাধারী হালদারের রিপেয়ারিং শপে।

"কতদূর হল জটুবাবু? কাল পাব তো?"

সিলিং থেকে চেন দিয়ে ঝোলানো একটা সাইকেল, তার দুটি চাকাই খেলা। জটাধারী সেটি নিয়ে ব্যস্ত। তুলসীর দিকে না তাকিয়েই বলেন, "যা বদলাতে হবে তাতে পাঁচশো টাকার বেশি পড়ে যাবে। হ্যান্ডেলের নীচের রডটা মরচে ধরে ক্ষয়ে গেছে, চেনটা পালটাতে হবে, পেছনের ব্রেক কাজ করে না, সামনের চাকার রিমটা তো গেছে, দুটো স্পোক ভাঙা। চালাতেন কী করে! খুব কম করে আরও তিন-চারশো টাকা লাগবে। বলেন তো করে দিচ্ছি। আর নয়তো ঝালাই করে জোড়া লাগিয়ে কাজ চলার মতো করে দিতে পারি। পাঁচশোর মধ্যেই হয়ে যাবে। এবার বলুন কী করবেন?"

বিপন্ন বোধ করল তুলসী। আরও তিন-চারশো টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া কাজ চলার মতো বলতেই বা কী বোঝায়?

"দেখুন, এটা নিয়ে একটা কম্পিটিশনে নামব। জোড়াতালি দিয়ে সারালে ভেঙে যাবে না তো?"

"কীরকম কম্পিটিশন সেটা, যাতে এই সাইকেল নিয়ে নামার কথা ভাবছেন?" জটাধারী অবিশ্বাসভরে তাকিয়ে থাকেন।

অস্বস্তিতে পড়ল তুলসী। এই লোককে এখন ট্রায়াথলন ব্যাপারটা বোঝানোর সময় তার নেই। বাড়ি ফিরতে হবে চার মাইল হেঁটে বা দৌড়ে।

তুলসীর মুখ দেখে জটাধারীর মনে হল, মাঠে বা রাস্তা বন্ধ করে যেসব অবিরাম সাইকেল চালানোর প্রতিযোগিতা হয়, তেমন কিছুতে বোধ হয় নামবে। তা ছাড়া সাইকেল কম্পিটিশন, তাও এইরকম সাইকেলে চড়ে, এ রাজ্যে কোথাও হয়ে থাকে বলে তো সে শোনেনি। তুলসীকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, "চলে যাবে। পঁচিশ-তিরিশ ঘণ্টা টানা চালালেও কিছু হবে না। ও ব্যাপারে গ্যারান্টি দিচ্ছি।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক।"

"তা হলে যা বললেন ওইভাবেই করে দিন। পাঁচশোর বেশি দেওয়ার সামর্থ্য আমার নেই। কাল কখন পাব?"

"কাল নয়, পরশু এই সময় আসুন। কাল কলকাতায় গিয়ে জিনিসপত্র কিনব। আর-একটা কথা, ভাল কন্ডিশনে যদি সেকেন্ড হ্যান্ড পার্টস পাই, আনব কী? এতে টাকা বাঁচবে।"

"আনুন। আমি কিন্তু পরশু ঠিক রাত আটটায় আসছি।"

বলরাম রাত থাকতেই বিছানা থেকে ওঠেন। ঘড়ি ধরে সাড়ে চারটের সময়, তাঁর ছেলে বলাইয়ের পরিত্যক্ত একটা পশমের টুপি মাথায় বসিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরোন। তিনি যান বিদ্যানগর স্টেশনের দিকে। লেভেলক্রশিং পেরিয়ে আরও পশ্চিমের বি.টি. রোডে পৌঁছন। অতঃপর বাঁ দিকে ঘুরে, ফাঁকা মসৃণ রাস্তায় বেশ জোরেই চালিয়ে বরানগরের টবিন রোড পর্যন্ত এলে পঁচিশ মিনিট সময় সম্পূর্ণ হয়। দূরত্ব ক্রমশ বাড়িয়ে আপাতত তিনি এই পর্যন্ত আসছেন। তারপর আবার একই পথ ধরে তিনি ফিরে আসেন। ঠিক পঞ্চাশ মিনিটে তিনি রামপ্রসাদ হস্টেলের সামনে এসে পৌঁছন এবং না থেমে আরও চোদ্দ মিনিটে কুলডাঙায় এবং রানি সায়রে। ঘড়ি ধরে এক ঘণ্টা চার মিনিট তিনি সাইকেলের ওপরে থাকেন। অবশ্য কয়েক মিনিটের হেরফের কোনও-কোনওদিন হয়। তাঁর লক্ষ্য সাইক্লিংয়ের সময়টাকে দেড়ঘণ্টা করা। এজন্য তিনি নিজেকে পাঁচদিন সময় দিয়েছেন।

একঘণ্টা সাইকেল চালিয়ে আসার পর রানিসায়রে পারাপার তাঁর কাছে কষ্টকর হয়। তিনি জানেন পারাপারে যতটা দূরত্ব, প্রায় ততটাই তাঁকে ট্রায়াথলনে অতিক্রম করতে হবে। গঙ্গায় স্রোতের সঙ্গে সাঁতরানো আর স্থির জলে সাঁতার কাটার মধ্যে শারীরিক তাগদের পার্থক্য ঘটে। তাই ওপারে গিয়ে ফিরে আসার সময় তাঁর হাত ভার লাগে, সায়রের মাঝামাঝি বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থেমে যান। কিছুক্ষণ জলে ভেসে থেকে আবার সাঁতার শুরু করেন। কিন্তু তাঁকে না থেমে পারাপার করতেই হবে যত মন্থর ভাবেই হোক না। এজন্য তিনি নিজেকে সাতদিন সময় দিয়েছেন।

বলরাম রানিসায়র থেকে ফিরে যাওয়ার আগেই তুলসী বাড়ির সামনে সাইক্লিং শেষ করে। সাইকেলটা বাবুর হাতে দিয়েই সে দৌড় শুরু করে। বাবু সাইকেল চালিয়ে দিদির সঙ্গে রাইহাটা পর্যন্ত মাইল তিনেক গিয়ে আবার তার সঙ্গেই ফিরে আসে।

জটাধারী কথামতো নির্দিষ্ট দিনেই সাইকেল মেরামত করে তুলসীকে দিয়েছিলেন। দেওয়ার সময় বলেছিলেন, "দেখবেন দিদি, এই সাইকেলই কম্পিটিশনে আপনাকে ফার্স্ট করে দেবে।" শুনে তুলসীর মন খুশিতে ভরে গেছল। সাইকেলের কিছু-কিছু অংশ জটাধারী বদলে দিয়েছেন, কয়েক জায়গায় ঝালাই করেছেন। দুটো মাডগার্ডে এবং রডগুলোয় কালো রঙও করে দিয়েছেন, যেটা করার কথা ছিল না।

বলরাম কাউকে জানাতে চান না, তিনি ট্রায়াথলনে নামতে চান এবং সেজন্য নিজেকে তৈরি করছেন, যেহেতু তিনি মনে করেন, লোকে এ-কথা শুনলে হাসবে বা আড়ালে হাসাহাসি করবে। এমনিতেই তো তাঁর চেহারা আর হাঁটা নিয়ে লোকে হাসত। হাঁটাটা সংযত করেছেন। কেউ আর তাঁর দিকে এখন তাকায় না। কিন্তু ট্রায়াথলনে নামবেন শুনলে আবার হাসিটা শুরু হয়ে যাবে। তুলসীকেও তিনি বলেননি। কথায়-কথায় পাছে বলে ফেলেন, সেজন্য তিনি ওর সঙ্গে দেখা করেন না, বাড়িতে গিয়ে খবরও নেন না। রানিসায়রে যাওয়ার একটা নতুন পথ তিনি বের করে ফেলেছেন, যেটা তুলসীদের বাড়ির ত্রিসীমানায় নয়। তিনি জানেন আমুদার ট্রেনিংসূচি তুলসী অনুসরণ করবে। সে তো সে সাইকেল আর দৌড় নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, রানিসায়রে আসবে বিকেলে। তাই তিনি সাইক্লিং সেরে ভোরেই রানিসায়রে আসেন। তাঁদের মধ্যে আর দেখা হয় না।

বলরাম দৌড়চ্ছেন রাত্রে। ধাক্কাধাক্কি করে ট্রেনে উঠে তিনি

অফিস থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেন। আটটায় তিনি বাড়ি থেকে দৌড়তে বেরোন। এজন্য তিনি নতুন কেড্‌স, হাফ প্যান্ট এবং স্পোর্ট্‌স গেঞ্জি কিনেছেন। মাথায় পশমের টুপিটা পরে তিনি ছুটতে যান গ্রামের দিকে, যেখানে রাত্রে রাস্তায় লোক প্রায় থাকেই না।

কিছু আলো-জ্বালা দোকান পথে পড়ে। দোকানে যারা থাকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকায়। আর কিছু নয়। পথচলতি মানুষরাও তাকায়। বলরাম অন্ধকারে হোঁচট খান, গর্তে পা পড়ে, খোয়া, ইট পায়ে ফোটে। মাঝে-মাঝে হাতঘড়ি দেখেন আর একই গতিতে ছুটতে থাকেন এবং গতিটি খুবই মন্থর। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। দাঁড়িয়ে হাঁফান। সারা শরীর অবসন্ন লাগে। সকালে সাইকেল, সাঁতার, অফিস করা, ট্রেনের ভিড় আর ধাক্কাধাক্কি ; তারপর রাতে এই ছোটা ! এক-একসময় রাস্তার ধারের গাছে দু' হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি জিরোন। তিনি জানেন প্রথম হওয়ার জন্য তিনি ট্রায়াথলনে নামতে চান না। আর এই বয়সে তা সম্ভবও নয়। তিনি চান সমাপ্ত করতে, সকলের শেষে পৌঁছেও।

তুলসী এবং বলরাম একই দিনে খবর পেলেন, রাজ্য ট্রায়াথলন চ্যাম্পিয়ানশিপ হবে কলকাতার পুবে বেলেঘাটার সুভাষ সরোবরে, ডিসেম্বরের উনিশ তারিখ রবিবারে।

বলরামকে খবরটা দিলেন মনোজ সামন্ত।

"গড়গড়িদা, আপনাকে ডাক্তারবাবু দেখা করতে বলেছেন, পারলেন আজই। উনি ফর্ম আনিয়ে রেখেছেন। আপনি আমাদের সামন্তপুর স্পোর্টিংয়ের হয়ে ট্রায়াথলনে নামবেন।"

"তা হলে ছুটির পর তোমার সঙ্গেই যাব। ওঁর বাড়ি তো আমি জানি না !"

মনোজের সঙ্গেই বলরাম ডাক্তারবাবুর চেম্বারে পৌঁছলেন। রোগীতে তখন অপেক্ষার ঘর ভর্তি। বাইরেও অনেকে দাঁড়িয়ে। মনোজ চেম্বারের মধ্যে ঢুকেই আধ মিনিটেই বেরিয়ে এসে বলরামকে হাত নেড়ে ডাকলেন। ডাক্তারবাবুর সামনে তখন এক মহিলা তাঁর অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে বসে।

"আপনার এন্ট্রি ফর্ম—" ডাক্তারবাবু ড্রয়ার খুলে ব্যস্তভাবে ফর্ম বের করলেন। "কোনও এন্ট্রি ফি নেই। স্পোর্ট্‌সটা পপুলারাইজ করার জন্যই ওরা কোনও ফি নিচ্ছে না। ডাক্তার সার্টিফিকেট লাগবে, সেজন্য তো আমি আছিই। আর সাইক্লিং ইভেন্টের জন্য মাথায় দিতে হবে একটা সেফ্‌টি হেলমেট। জোগাড় করতে পারবেন ?"

বলরাম অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন। "এ জিনিস আমি পাব কোথায় ?"

ডাক্তারবাবু কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে বললেন, "অবশ্য না হলেও চলবে। একেবারে নতুন স্পোর্ট্‌স তো, ওরা বলেছে এটাকে পপুলার করার জন্য নিয়মকানুনের কড়াকড়ি করবে না। নিজের রিস্কে কেউ যদি হেলমেট ছাড়াই সাইকেল চালায় তো চালাক, আপনি এই ওয়েভার অ্যান্ড ইনডেমনিটি ফর্মটায় সই করে দিন। মারা গেলে, পঙ্গু হয়ে গেলে, কি কোনও জিনিস হারালে সেজন্য স্টেট অ্যাসোসিয়েশন দায়ী থাকবে না বলে এতে লেখা আছে।"

বলরাম দু' পাতা জোড়া ইংরেজি ফর্ম না পড়েই সই করে দিলেন। ডাক্তারবাবু ফর্মটা আবার ড্রয়ারে রেখে বললেন, "কিছু জানাবার থাকলে মনোজবাবুকে দিয়ে খবর দেব আর উনিশে ডিসেম্বর আমি নিজে সুভাষ সরোবরে থাকব।"

ডাক্তারবাবুর চেম্বার থেকে বলরাম যখন বেরোলেন, তুলসীও তখন জগন্নাথবাবুর বসার ঘর থেকে বেরনোর জন্য সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

"অনুকে তো তুই জানিস, আমার ভাগ্নি। ওর শ্বশুরবাড়ি সুভাষ সরোবরের খুব কাছে, হেঁটে তিন-চার মিনিট। আমি ফোন করে বলে রাখব, আগের দিন রাতে ওর বাড়িতে গিয়ে থাকবি। সাইকেলটা সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলিস না।"

তুলসী হেসে মাথা নাড়ল। "আর যে ভুলই করি না কেন, এটা করব না।"

"কম্পিটিশনের আগের দিন সকালে কিন্তু অবশ্যই সুভাষ সবোবরে যাবি। সব কম্পিটিটারদের ওরা নিয়মকানুন আর রুট বুঝিয়ে দেবে। এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। চিনে যেতে পারবি তো ?"

"পারব। আপনি অনুদির ঠিকানাটা দিন। গ্রামে থাকি বলে কলকাতা চিনি না নাকি ? কম্পিটিশনের দিন আপনি ওখানে থাকবেন তো কাকাবাবু ?" তুলসী অসহায় চোখে তাকাল। এই ট্রায়াথলন তার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হতে চলেছে। একদম একা হয়ে, নিজের পরিচিত পরিবেশ থেকে দূরে, ভরসা পাওয়ার মতো একটা চেনা মুখও যদি তখন থাকে তা হলে মনে কিছুটা জোর সে পাবে। কিন্তু সেখানে হাজির থাকার জন্য কাকে সে পাবে ? ছোট ভাই বাবু ছাড়া এখান থেকে যাওয়ার মতো আর একজনই, এই জগন্নাথকাকা।

"যাব না মানে ?" ঠাণ্ডা মাথার জগন্নাথবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন। "আমাদের স্পোর্ট্‌স কমিটিতে দু-তিনজন কথা তুলেছে ট্রায়াথলনে আবার রিক্রুট করা কেন ? আমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার মাথা যে ঠিক আছে সেটা তোকে প্রমাণ করে দিতে হবে। দিল্লি থেকে বোর্ডের অ্যাপ্রুভাল আমি পেয়ে যাব। এখন বোর্ডে যিনি সেক্রেটারি তাঁর আউটলুকটা খুব মডার্ন, খেলার সব খবরাখবর রাখেন। এই রাজ্যে কোনও ট্রায়াথলনিস্ট এখনও কোথাও চাকরি পায়নি। আমার অফিস প্রথম চাকরি দেবে; এটাই হবে আমার সাফল্য।" জগন্নাথবাবু বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের ঘুসি বসালেন।

স্টেট চ্যাম্পিয়ানশিপের আগের দিন বলরাম বাজার করে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরোলেন সকাল সাতটায়। শনিবার তাঁর অফিস বন্ধ। তিনি লেভেলক্রশিং থেকে দেখতে পেলেন কলকাতার দিকে একটা ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ওই ট্রেনেই উঠেছে তুলসী। সে জানত না বলরামও ট্রায়াথলনের একজন প্রতিযোগী। তাই সুভাষ সরোবরে স্পোর্ট্‌স কাউন্সিলের সুইমিং পুলে জমায়েত ছোট-বড় মিলিয়ে বয়সভিত্তিক তিনটি বিভাগের ষাট-সত্তরজন প্রতিযোগীর মধ্যে হঠাৎ বলরামকে দেখতে পেয়ে সে ভীষণ অবাক হয়ে গেল।

"মেসোমশাই, আপনি এখানে ?"

প্রথমে বলরাম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন। তারপর মনে হল আর গোপন রেখে কোনও লাভ নেই। কালই তো তুলসী দেখতে পাবে এই প্রতিযোগিতায় তিনিও একজন প্রতিযোগী। এবার সত্যি কথাটা বলে দেওয়াই ভাল।

"আমি তো কাল এখানে নামছি।"

"যাঃ।" তুলসী বিশ্বাস করল না। বলরাম মুহূর্তের জন্য বেদনা বোধ করলেন। তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছে। সঙ্গে-সঙ্গে এটাও বুঝলেন, তুলসীর অবিশ্বাস করাটা খুবই স্বাভাবিক। ট্রায়াথলনের মতো কষ্টসাধ্য খেলায় এদেশে তাঁর মতো বয়সের কেউ যে নামতে পারে, কে সে-কথা বিশ্বাস করবে ?

"বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি, বেশ, কালই দেখতে পাবে।"

"বেশ, দেখব।" তুলসী হেসে বলল বটে, কিন্তু ওর মুখ দেখে বলরাম বুঝলেন, তাঁর নামার কথাটাকে ঠাট্টা হিসেবেই নিয়েছে।

সুভাষ সরোবর ওরা কেউই আগে দেখেনি। প্রথম দর্শনেই তুলসী বলল, "মেসোমশাই, এটা কিন্তু রানিসায়রের থেকে অনেক বড়।"

"হোক না বড়, সেজন্য দেড় কিলোমিটারের বেশি তো আর

সাঁতরাতে হবে না !"

সরোবরটি গোল বা চৌকো নয়, কিছুটা ডিম্বাকৃতির। এর পুবে একটি বড় এবং পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত একটি ছোট দ্বীপ রয়েছে। ওই দ্বীপ দুটিতে হরিণ রাখা ছিল। এখন আর নেই। রানিসায়রের ঘাট বলতে যা বোঝায় এখানেও সেইরকম। পাড় থেকে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া ভাঙাচোরা জমি, সেটাই হল প্রতিযোগিতার প্রথম বিষয় সাঁতারের শুরুর জায়গা। সংগঠকরা সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন, সাব-জুনিয়ার, জুনিয়ার ও সিনিয়ারদের কোন পথ ধরে কতটা সাঁতরাতে হবে। সিনিয়ারদের অর্থাৎ তুলসী ও বলরামকে প্রথমে বড় দ্বীপটা বেড় দিয়ে বাঁ দিকে পশ্চিমে ছোট দ্বীপের দিকে যেতে হবে। ছোট দ্বীপটিকেও বেড় দিয়ে আরও এগিয়ে ভাসমান একটি পতাকা ঘুরে আবার ফিরে আসতে হবে শুরুর এই জায়গায়। মোট দেড় কিলোমিটার সাঁতার কেটে জল থেকে উঠেই প্রায় তিরিশ মিটার ছুটে গিয়ে উঠতে হবে সাইকেলে। তার মধ্যেই চটপট পরে নিতে হবে জুতো আর একটা গেঞ্জি। নম্বর লেখা সাঁতারের টুপিটা অবশ্য মাথায় বাঁধাই থাকবে।

সরোবর বেড় দিয়ে যে আড়াই কিলোমিটার পিচের রাস্তা, তাই ধরে সাইকেলে তাদের ষোলোবার পাক দিতে হবে। ওরা সবাই চাক্ষুষ করবার জন্য রাস্তা ধরে হাঁটল। সাইকেল চালাবার পর এই রাস্তা ধরেই তাদের দৌড়তে হবে চারপাক। রাস্তাটি, বলরামের মনে হল, বিদ্যানগরের থেকে অনেক ভাল। তবে অনেক জায়গায় ভাঙাও রয়েছে। কিন্তু যে জিনিসটি তাঁর কাছে মসৃণ গতিতে স্থিরভাবে সাইকেল চালাবার পথে বিঘ্নকারী বলে মনে হল, সেটি হচ্ছে স্পিড ব্রেকার।

"মেসোমশাই, ওই দেখুন, সল্ট লেক স্টেডিয়াম দেখা যাচ্ছে।" রাস্তা দেখার থেকেও তুলসীর চোখ আশপাশের দিকেই বেশি। "আপনি ওখানে কখনও খেলা দেখেছেন ? আমি দেখিনি। খুব ইচ্ছে করে একবার অন্তত রাত্রে একটা ফুটবল ম্যাচ দেখতে।"

"কিন্তু এখন ভাল করে দেখে নাও এই স্পিড ব্রেকারগুলোকে। ফুটবল ম্যাচ দেখার কথা পরে ভেবো। "এই দ্যাখো," বলরাম আঙুল দিয়ে দেখালেন, রাস্তার মাঝে আড়াআড়ি স্ফীত হয়ে থাকা জায়গাটি।

"অসুবিধের তো কিছু নেই।" তুলসীর সহজ ও সরল স্বর বুঝিয়ে দিল স্পিড ব্রেকার কোনও সমস্যা নয় তার কাছে। "স্পিড কমিয়ে সাইকেল আস্তে করে নিলেই হবে। কেমন রাস্তা দিয়ে কুলডাঙা থেকে যাতায়াত করতে হয় তা তো জানেন। আচ্ছা মেসোমশাই এটা কিসের মন্দির বলুন তো ?"

"গিয়ে দেখে এসো।"

"রাস্তা থেকে সরোবরের দিকের জমিতে সাদা একটি মন্দির গৃহ। তুলসী ছুটে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়েই ফিরে এল।

"লেখা রয়েছে লোকেশ্বর বাবার পুরাতন মন্দির। ভেতরে শিবলিঙ্গ। হনুমান মূর্তিও রয়েছে। আচ্ছা মেসোমশাই, আপনি ভগবান মানেন ?"

"মানি না, তবে কাল মানব।"

"আপনি কি কাল নামছেন ?"

"হ্যাঁ।" বলেই তুলসীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন এখনও বিশ্বাস করেনি।

"আচ্ছা, এই যে বিরাট-বিরাট কংক্রিটের এত পাইপ পড়ে রয়েছে, এগুলো কী জন্য ?"

তুলসীর কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা না করে বলরাম তার নজর টেনে বললেন, "রাস্তাটা দ্যাখো, এখানেও একটা স্পিড ব্রেকার।"

তুলসী দেখে বলল, "এসব এখন দেখে কী হবে মেসোমশাই, যখন চালাব তখন চোখ রেখেই চালাব। সরোবরের এই দিকটা দেখে আমার কিন্তু রানিসায়রের কথা মনে পড়ছে। বেলা হলে রানিসায়রে চান করার জন্য যেরকম লোক হয়, গোরু-বাছুর এনে গা ধোওয়ায়, তাকিয়ে দেখুন অনেকটা সেইরকম। ওরে বাবা কতগুলো মোষও রয়েছে, কেন জানি এদের আমার খুব ভয় করে। আচ্ছা, মোষেরা কি খুব হিংস্র হয় ?"

"বোধ হয়, হয়। শুনেছ তো, ওঁরা বললেন আজ রাত্রে এখানে সাইকেল রাখার ব্যবস্থা আছে। তুমি সঙ্গে করে আনলে না কেন ? তা হলে আর কাল সকালে ট্রেনে চড়িয়ে আসতে হবে না।"

তুলসী মুচকি হেসে বলল, "সে ব্যবস্থা আমার আছে। এখানে জগন্নাথকাকার ভাগ্নি অনুদির বাড়িতে আজ রাতে আমি আর ভাই থাকব। সাইকেল নিয়ে আজই রাতের ট্রেনে চলে আসব।"

বলরাম ভাবলেন, সাইকেল এনে রেখে দিয়ে আবার তাঁর বিদ্যানগর ফিরে যাওয়ার থেকে বরং কাল প্রথম ট্রেনেই ভেন্ডার কামরায় উঠে চলে আসাই ভাল। রোজই তো ভোরে সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোন, সুতরাং বিমলা বুঝতেই পারবে না কোথায় যাচ্ছি। নিশ্চয়ই দুপুরের মধ্যেই বাড়ি ফিরে যাওয়া যাবে। দোকান-বাজার আজ রাতেই সেরে রাখতে হবে।

"মেসোমশাই, এই দেখুন একটা মসজিদ। জলের এপারে আর ওপারে মুখোমুখি মন্দির আর মসজিদ, অদ্ভুত নয় ?"

"তুলসী, কাল তোমাকে যাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে তাদের সম্পর্কে কোনও খোঁজখবর কি নিয়েছ ? এই যে কুড়ি- পঁচিশজন মেয়েকে দেখছি এদের মধ্যে মনে হচ্ছে সিনিয়ার মেয়ে খুবই কম, সাত-আটজন বড়জোর। তোমার কী মনে হচ্ছে ওদের দেখে ?"

"কিছুই মনে হচ্ছে না।" নির্বিকার মুখে তুলসী বলল। "আগে থাকতে মনের মধ্যে ভয় ধরিয়ে রাখলে সেটা ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বেড়েই যায়। তিনটে বিষয়ে কম্পিটিশন, সবাই তিনটেতে দড় হবে আপনি কি তাই মনে করেন ?"

"না।"

"সাঁতারে কলকাতার মেয়েরা ভাল। ওরা রেগুলার শেখে, প্র্যাকটিস করে, কম্পিটিশনে নামে। আমি শিখিনি, কম্পিটিশনে কখনও নামিনি। আমি জানি সাঁতারে আমি পিছিয়ে থাকব, কিন্তু সাইকেলে আমি অনেকটা মেক-আপ করে নেব। মাঝের এটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমার ভরসা রানিং। দশ কিলোমিটার দৌড়েছি তো, আমি জানি কীভাবে দৌড়তে হবে। আমুদার কথা মনে আছে আপনার ?"

"আছে। কিন্তু তুমি কি জানো মাদ্রাজে একজন বাহাত্তর বছরের জাপানি ট্রায়াথলনে কম্পিট করে ফিনিশও করেছেন ?"

"কই না তো !" তুলসী বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। "বাহাত্তর বছরের ?"

বলরাম আলতো হেসে বললেন, "তা হলে তুমি আমার কথা অবিশ্বাস করছ কেন ? আমি তো বাহাত্তরের অনেক কম।"

"মেসোমশাই... সত্যি !"

তুলসী আবেগের বশে বলরামের দুই হাত চেপে ধরল। "কী দারুণ ব্যাপার, আমরা দু'জনেই কাল নামছি।"

"হ্যাঁ নামছি। আর আমার মন বলছে তুমি জিতবে।"

তুলসী ঝপ করে বলরামকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার মন বলছে আপনি ফিনিশ করবেন।"

তুলসীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলরাম মনে-মনে বললেন, "চাকরি যেন পায়। কাল নয়, ভগবান, আজ থেকেই তোমায় আমি মানছি।"

॥ ১৩ ॥

বেলেঘাটা সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের ঘাটে, সুভাষ সরোবরের হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে বারোটি ছেলে ও চারটি মেয়ে। তাদের পেছনে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

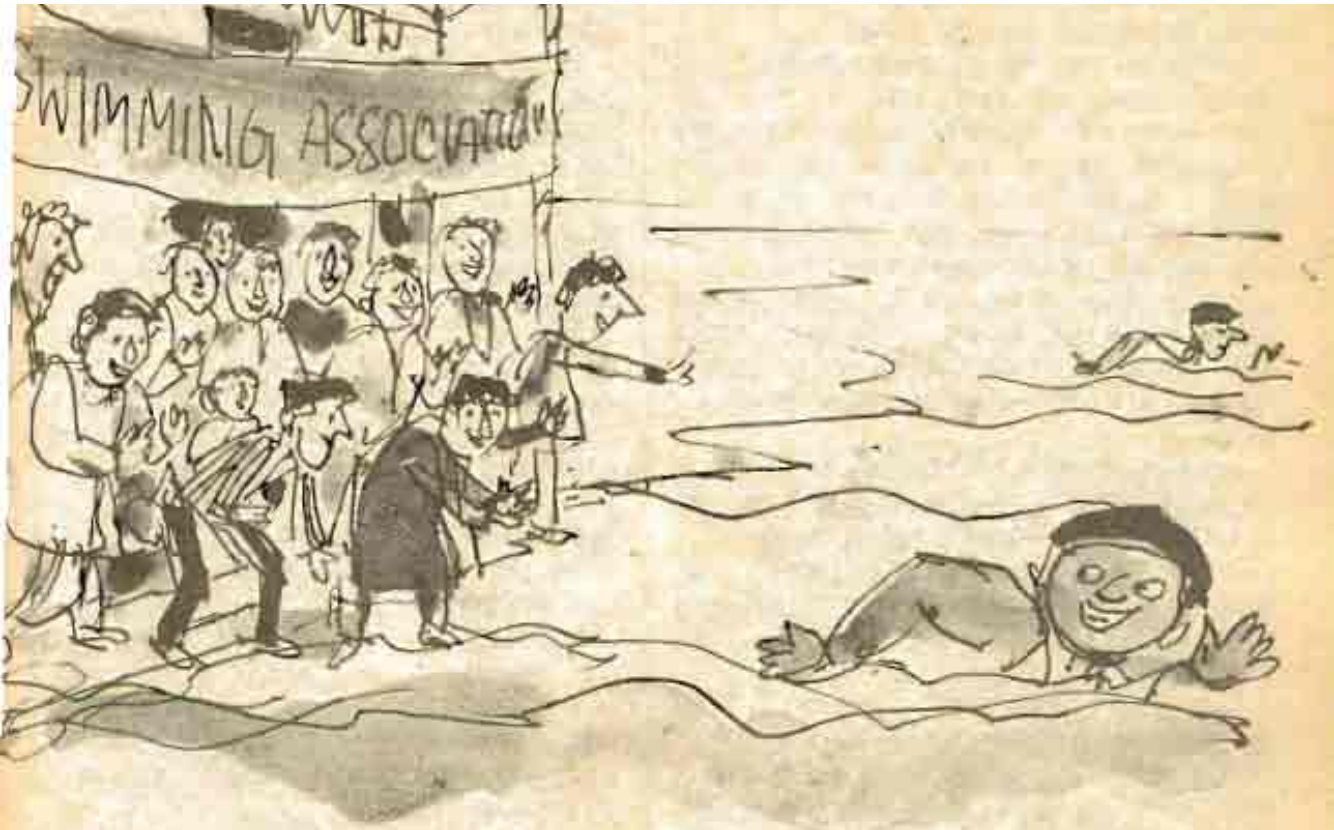

পায়ের পাতা জলে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে, মাথায় কাপড়ের টুপি ও কস্টিউম পরা একজন পুরুষ প্রতিযোগী। তাঁর আচরণের মধ্যে কোনওরকম অধৈর্যের বা নার্ভাস হওয়ার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে না। ইনি বলরাম গড়গড়ি। চারটি মেয়ের অন্যতম তুলসী। তার ভাই বাবু উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনা নিয়ে দিদির দিকে তাকিয়ে। ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে জগন্নাথবাবু।

সকাল আটটা থেকে রাজ্য ট্রায়াথলন চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রথমে সাব-জুনিয়ার ছেলে ও মেয়েদের দিয়ে শুরু হয়। তারপর হয় জুনিয়ার ছেলে ও মেয়েদের। এখন শুরু হতে চলেছে সিনিয়ারদের প্রতিযোগিতা। অভিভাবক, সংগঠক, ভলান্টিয়ার আর দর্শকদের ভিড় ও ব্যস্ততায় সরোবরের দক্ষিণ দিকটা সরগরম। না উষ্ণ না শীতল, এমন একটা বাতাবরণ বিরাজ করছে সরোবর ঘিরে। ছুটির দিন ; তাই প্রচুর মানুষ। তারা ব্যস্ত হয়ে পথ চলছে, ঘাসে বসে গল্প করছে অথবা জলে নেমে স্নান করছে। একটা কিছু প্রতিযোগিতা হচ্ছে জানতে পেরে বহু মানুষ ধারেকাছের বাড়ি থেকে এসে দর্শক হয়েছে।

শুরুর সঙ্গে-সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রতিযোগীরা। বলরাম কোমর জলে নেমে গিয়ে সামনে তাকালেন। ষোলোজোড়া হাত ও পায়ের তাড়নায় জলে ফেনা কাটছে। ষোলোটি লাল টুপির মধ্যে বাইশ নম্বর লেখা টুপিটিকে খুঁজলেন, কিন্তু দেখতে পেলেন না। একবার পেছনে তাকিয়ে খুঁজলেন ডাক্তারবাবুকে। বলেছিলেন তো আসবেন। জলপড়ার সময় নষ্ট না করে তিনি জলের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেন।

বড় দ্বীপটা প্রায় দেড়শো মিটার দূরে। বলরাম সেটিকে বেড় দিয়ে যখন ছোট দ্বীপটার দিকে যাচ্ছেন তখন সামনের ষোলো জনের ঝাঁক থেকে বেরিয়ে সাত-আটটি ছেলে এগিয়ে গেছে। সব থেকে পিছিয়ে থাকা সাঁতারুটির থেকেও বলরাম একশো মিটার পিছিয়ে। তিনি জানেন, ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার কোনও তাগিদ তাঁর নেই। তাঁকে দম আর ক্ষমতা সঞ্চয় করে রাখতে হবে।

তুলসী ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে না, সে সিনিয়ার মেয়েদের বিভাগের চারজনের একজন। তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি তিনজনের সঙ্গে এবং তার পূর্ব অনুমান মতোই সে তাদের থেকে পিছিয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় দ্বীপ ছাড়িয়ে আরও প্রায় দুশো মিটার দূরের ফ্ল্যাগটার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় সে একবার মুখ তুলে দেখল অন্তত বারোটা লাল টুপি ফ্ল্যাগটাকে ঘুরে স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরে যাচ্ছে। এখন তার পাশে শুধু দুটি ছেলে, যারা অর্ধেক পথ এসেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে চেষ্টা করল ওদের টুপিতে তিয়াত্তর নম্বর লেখা আছে কি না দেখতে। কিন্তু দেখতে পেল না। দেখার কথাও নয়, কেননা বলরাম তখন তার প্রায় তিনশো মিটার পেছনে। তুলসী অন্য তিনটি মেয়ের নম্বর মনে করে রেখেছে। একুশ নম্বর একটু বেঁটে, পায়ের ডিমগুলো খুব পুষ্ট, নাকটা বসা। তেইশ নম্বর তারই মতো ছিপছিপে, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, দাঁত উঁচু। চব্বিশ নম্বর বোধ হয় নেপালি মেয়ে, চোখ-মুখ গায়ের রং সেইরকমই। এরা তিনজনই এখন তার থেকে অনেক এগিয়ে।

বলরাম ফ্ল্যাগটাকে ঘুরে যখন প্রায় এক কিলোমিটার অতিক্রম করেছেন তখন প্রথম ছেলেটি সাঁতার শেষ করে জল থেকে উঠল এবং তার অর্ধ মিনিটের মধ্যে আরও সাতজন। এই সময় দেখলেন তাঁর সামনের ছেলেটি জলে ডুবে গিয়ে আবার ভেসে উঠল। দু' হাত তুলে মাথা নেড়ে হাঁ করছে আর ডুবছে। ডাঙায় দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্য। একজন লাইফ সেভার জলে ঝাঁপিয়ে

সাঁতরে ছেলেটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে বলরাম থমকে গেলেন। ছেলেটিকে ধরে লাইফ সেভার ডাঙার দিকে নিয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি আবার সাঁতার শুরু করলেন।

তুলসী সাঁতার শেষ করল দুটি ছেলের সঙ্গে, কিন্তু তিনজন মেয়েরই পেছনে। জল থেকে উঠেই সে দৌড়ে গেল সাইকেলের দিকে। দ্রুত হাতে কস্টিউমের ওপরই পরে নিল হাফ প্যান্টটা, পায়ে পরে নিল কেড্‌স জোড়া এবং গায়ে দিল গেঞ্জিটা। এক মিনিটের মধ্যেই তিনটি কাজ শেষ করে সে সাইকেলে চেপে বসল। তখন তেইশ নম্বর এক কিলোমিটার এগিয়ে গেছে এবং তার পেছনেই চব্বিশ ও একুশ নম্বর।

সকলের শেষে বলরাম জল থেকে উঠে দেখলেন বুকে ব্যাজ আঁটা চার-পাঁচজন লোক তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। সবচেয়ে বর্ষীয়ান প্রতিযোগী হিসেবে ইতিমধ্যেই তিনি খ্যাত হয়ে গেছেন। তাঁর প্রতি একটু বেশিই যেন নজর দেওয়া হচ্ছে বলে তাঁর মনে হল।

অপেক্ষমাণদের একজন রাজ্য ট্রায়াথলন অ্যাসোসিয়েশনের সচিব। তিনি ব্যস্তভাবে বললেন, "বলরামবাবু, চটপট জুতো আর গেঞ্জিটা পরে নিন। প্রথম ছেলেটা দু' পাক এই শেষ করল।"

শ্রান্তিভরা মুখে একটু হেসে বলরাম কেড্‌স পরলেন। গেঞ্জির ঝুলটা তাঁর প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি পৌঁছল। হাফ প্যান্ট পরার দরকার হল না। তিনি সাইকেলে উঠতে-উঠতে দেখলেন ডাক্তারবাবু আসছেন প্রায় ছুটেই।

"বেরোবার মুখে হঠাৎ এক হার্ট অ্যাটাকের কল...।" তিনি কথা সম্পূর্ণ করার আগেই বলরাম তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেলেন।

'অনেক পিছিয়ে গেছি, ব্যবধানটা আমাকে কমাতেই হবে,' এই চিন্তাটা মাথায় নিয়ে তুলসী সাইক্লিং শুরু করল। বহুদূরে তিন-চারজন সাইক্লিস্টের পিঠের দিকে তাকিয়ে সে জোরে-জোরে প্যাডেল করে একশো মিটার যাওয়ার পরই সাইকেলটা ছিটকে লাফিয়ে উঠল। ঘুরে যাওয়া হ্যান্ডেল শক্ত হাতে বশে এনে তুলসী স্পিড ব্রেকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে গেল। আরও দুশো মিটার পর লোকেশ্বর বাবার মন্দিরের আগে আর-একটি স্পিড ব্রেকার। সাইকেলের গতি কমিয়ে সেটা অতিক্রম করে সে গতি বাড়াল এবং ক্রমশই বাড়াতে থাকল।

রাস্তা থেকে ধারে সরে যাচ্ছে পদচারীরা। বাইরে থেকে যেসব রাস্তা এসে ঢুকেছে সরোবরের এই রাস্তায়, তার মুখগুলিতে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। হঠাৎ কোনও সাইকেল, মোটর বাইক ঢুকে এসে বিপত্তি তৈরি যেন না করে, সেটা রোধ করাই তাদের কাজ। কিন্তু বিঘ্ন ঘটায় তো মানুষই। দুটি বাচ্চা মেয়ে এমন সময়ে রাস্তা পার হচ্ছিল যখন এক পুরুষ সাইক্লিস্ট প্রায় তাদের ওপর এসে পড়ছিল। ব্রেক কষে সে টলে পড়ে গেল। মেয়ে দুটি ভয় পেয়ে দৌড় দিল আর তুলসী তখন সেই সাইক্লিস্টকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল।

ডান দিকে কলকাতা কর্পোরেশনের কর্মীদের জন্য বোধ হয়, সারি দিয়ে একতলা টালির চালের কোয়ার্টার। তারপর বড়-বড় কংক্রিট পাইপ পড়ে রয়েছে, তারপর সরোবরের বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকার একটা চওড়া প্রবেশ পথ। তার আগে একটা স্পিড ব্রেকার। তারপর মসজিদ। তুলসী কুঁজো হয়ে প্যাডেল করতে-করতে একবার মুখ তুলে দেখে নিল তার পঞ্চাশ মিটার দূরে একটি মেয়ের পিঠ। 'এইবার একে আমি পেছনে ফেলব,' নিজেকে এই বলে সে আরও ঝুঁকে, সিট থেকে নিজেকে সামান্য তুলে প্যাডেলে চাপ দিল। পিস্টনের মতো ওঠানামা করতে লাগল তার দুই পা।

একুশ নম্বর পেছনে পড়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তুলসী যখন তাকাল তখনই একটা স্পিড ব্রেকারের ওপর উঠল তার সাইকেল। একটা বড় ঝাঁকুনি পেল সে। মনে-মনে সে বলল, 'ভাগ্যিস সাইকেলটা সারিয়ে নিয়েছিলাম, নয়তো এতক্ষণে চাকাটাকা খুলে বেরিয়ে যেত। একুশ গেল, এবার ধরতে হবে তেইশ বা চব্বিশকে।'

বলরামের কাউকে ধরার জন্য তাড়া নেই। তাঁকে বনবন করে পেরিয়ে গেল এক সাইক্লিস্ট। বলরাম মুচকি হাসলেন এবং ধাওয়া করলেন। ছেলেটা কত পাক দিয়ে ফেলেছে কে জানে! কিন্তু খুব বেশি পিছিয়ে থেকে কম্পিটিশন শেষ করাটা মর্যাদাকর হবে না। এবার একটু স্পিড বাড়ানো যেতে পারে। এই ভেবে বলরাম গতি বাড়ালেন, আর তখনই তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়া সাইকেল থেকে তুলসী চেঁচিয়ে বলল, "মেসোমশাই, আর একটু জোর লাগান।"

ফিনিশিং পয়েন্টে এখন ভিড়। গণ্যমান্য অতিথিরা রাস্তার ধারে চেয়ারে বসে। সেখানে টাইমকিপার আর রেকর্ডাররা। নম্বর দেখে তাঁরা চেঁচিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন প্রতিযোগীদের, আর কত পাক সাইকেল তাদের চালাতে হবে। প্রত্যেকর নামের পাশে সংখ্যার ঘরে টিক পড়ছে। মেয়েদের মধ্যে এগিয়ে আছে তেইশ নম্বর। টাইমকিপারদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তুলসী শুনল, চিৎকার করে কে বলল, "ইলেভেন টু গো।" আর শুনল, "দিদি, সামনেই তেইশ।" সে আড়চোখে দেখল জগন্নাথকাকা ভিড় থেকে একটু দূরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, মুখ ফ্যাকাসে। "তুলসী আরও জোরে," এইটুক ছাড়া আর কিছু তিনি বলতে পারলেন না।

আরও জোরে। সামনে তেইশকে সে দেখতে পাচ্ছে। স্পিড ব্রেকার দেখেও সে গতি কমাল না, শুধু সিট থেকে নিজেকে তুলে দিল। একটা ঝাঁকুনি সহ্য করল সাইকেলটা... আরও জোরে। প্রথম তাকে হতেই হবে!

ডান দিকে কর্পোরেশনের কোয়ার্টারগুলো। তারপর সিমেন্টের পাইপগুলো, তারপর বাইরে যাওয়ার চওড়া রাস্তা। তুলসী এগোচ্ছে রাস্তার দিকে। আর ঠিক তখনই সার দিয়ে বাইরে থেকে সরোবর এলাকায় ঢুকল তিনটি মোষ, তাদের সঙ্গে একটি বাচ্চা মোষ। কী খেয়াল হল বাচ্চাটার, সে হঠাৎ ওদের সঙ্গ ছেড়ে বাঁ দিকে ছুট দিল যেদিক থেকে তুলসী আসছে। তিনটি মোষের একটি, বোধ হয় বাচ্চার মা, মুখ ফিরিয়ে বাচ্চাটার উদ্দেশ্যে একটা ডাক দিল।

তুলসী দেখল, বাচ্চা মোষটা তার দিকেই লাফিয়ে-লাফিয়ে আসছে আর তার মা, থলথলে মাংসল চেহারার, শিংওলা একটি মোষ, বিস্ফারিত চোখে, বোধ হয় তার দিকেই তাকিয়ে ছুটে আসছে, হয়তো ধরে নিয়েছে তার বাচ্চাকে সাইকেল আরোহী আক্রমণ করবে।

কী করব এখন? প্রশ্নটা মাথার মধ্যে ঝলসে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে তুলসী সাইকেলের হ্যান্ডেল ডান দিকে ঘোরাল। সেইদিকেই পড়ে রয়েছে কংক্রিটের পাইপ। সামনের চাকা পড়ল স্পিড ব্রেকারে, সে ব্রেক কষল।

এর পর তুলসী নিজেকে দেখতে পেল সাইকেল থেকে উড়ে গিয়ে জমির ওপর পড়তে আর সাইকেলটি পাইপে সজোরে ধাক্কা খেয়ে তার থেকে দশ মিটার দূরে পড়ে আছে। মোষটি তুলসীর দিকে না তাকিয়ে সোজা ছুটে গেল বাচ্চার দিকে। কিছু লোক ঘটনাটি দেখল, কিন্তু তুলসীকে চটপট উঠে দাঁড়াতে দেখে তারা সাহায্যের জন্য আর এগিয়ে এল না। পরপর দু'জন সাইক্লিস্ট তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকিয়ে দেখে গেল।

সময় নষ্ট হল। মোষটা মোটেই হিংস্র নয়, এই ধারণা নিয়ে তুলসী এগিয়ে গিয়ে হ্যান্ডেল ধরে সাইকেলটি তুলেই বজ্রাহত হল। হ্যান্ডেলসহ সাইকেলটি তার হাতে উঠল সামনের চাকাটিকে জমিতে রেখে। হ্যান্ডেল থেকে সামনের চাকায় নেমে যাওয়া রডের যেখানে ঝালাই করা হয়েছে সেখানেই রডটা দু'

টুকরো হয়ে গেছে। শুধু সরোবর আর তাকে ঘিরে যাবতীয় জড় ও চলমান দৃশ্যই নয়, তার সারা জীবনটাই যেন পুড়ে খাক হয়ে গেল। অন্ধকার ছাড়া চোখে আর কিছু সে এখন দেখতে পাচ্ছে না। ধীরে-ধীরে সে রাস্তার ধারে বসে পড়ল।

ঠিক সেই সময় বলরাম ছিলেন সরোবরের বিপরীতে, তুলসীর থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পেছনে। তিনি বারবার শুধু নিজেকে বলে যাচ্ছিলেন : আঁকুপাকু নয়, মাথা গরম নয়, পাশ দিয়ে সবাই চলে যাচ্ছে তো যাক। নির্দিষ্ট একটা স্পিড ধরে রেখে চালিয়ে যেতে হবে। সেই কচ্ছপ আর খরগোশের গল্পটা মনে রাখা দরকার। স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন্‌স....। কম্পিটিশনের এখনও অর্ধেকও হয়নি। এর পর আছে দৌড়। সেজন্য দম জমা করে রাখতে হবে, পা দুটোর ক্ষমতা ধরে রাখতে হবে, এই ট্রায়াথলন শেষ করতেই হবে।

বলরাম ব্রেক কষলেন তুলসীকে ঘাসের ওপর বসে থাকতে দেখে। তার সামনে দু' খণ্ড হওয়া সাইকেলটি।

"এ কী হল!" বলরাম সাইকেল থেকে নেমে এগিয়ে এলেন। "ভাঙল কী করে?"

তুলসী শূন্য চোখে বলরামের মুখের দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে শুধু মাথা নাড়ল। মাথাটি নামিয়ে নিল। টসটস করে জল পড়ল গাল বেয়ে।

"মেসোমশাই আমার ভাগ্য! বলেছিলেন আমি নাকি জিতব। এই আমার জেতা দেখুন।" আঙুল দিয়ে সে ভাঙা সাইকেলটিকে দেখাল।

"আমার কথা মিথ্যে হবে না তুলসী, ওঠো।"

তুলসী মুখ নামিয়ে মাথা নাড়ল।

"ওঠো, ওঠো।" বলরাম চাপা স্বরে চিৎকার করে উঠলেন। তেইশ নম্বর এই সময় সাইকেল নিয়ে তাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় আড়চোখে তাকাল।

বলরাম খপ করে তুলসীর ঘাড়ের কাছে গেঞ্জিটা বাঁ মুঠোয় ধরে তাকে টানলেন। হকচকিয়ে তুলসী উঠে দাঁড়াল।

"সময় নষ্ট কোরো না, সবাই এগিয়ে যাচ্ছে... এক্ষুনি ওঠো।"

নিজের সাইকেলটি বলরাম এগিয়ে দিলেন। তুলসী কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলরাম তার আগেই ওর ডান হাতটা তুলে হ্যান্ডেলে রেখে সাইকেল ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন সরোবরের জলের দিকে। সাইকেল পড়ে যাচ্ছিল, তুলসী শক্ত মুঠোয় হ্যান্ডেলটা ধরে ফেলল আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা কঠিন ইচ্ছা তড়িৎগতিতে তার ডান হাত বেয়ে চেতনায় ঢুকে গেল। সে শক্ত দু' হাতে হ্যান্ডেল ধরে প্যাডেলে পা রাখল।

বলরাম জলের দিকে যেতে-যেতে থেমে গেলেন। মুখ ঘুরিয়ে দেখতে পেলেন তাঁর সাইকেলটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কুঁজো হয়ে থাকা একটি পিঠ, যার দুই পা ওঠানামা করছে শিকার তাড়া করা চিতাবাঘের মতো। বলরাম দ্বিখণ্ডিত সাইকেলের কাছে ফিরে এলেন।

তেরো পাক শেষ হওয়ার আগেই তুলসী ধরে ফেলল মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে থাকা চব্বিশ নম্বরকে। বহু আগেই সে একুশ নম্বরকে পেছনে ফেলে দিয়ে এসেছে। এখনও বাকি তিন পাক। তেইশ নম্বর ভাল চালায়, সাইকেলটাও দামি। তুলসীর সাইকেল বদলে যাওয়াটা বাবু প্রথম লক্ষ্য করে বলল, "দেখুন দেখুন, দিদি মেসোমশাইয়ের সাইকেল নিয়ে চালাচ্ছে।"

"তাই তো! তা হলে বলরামবাবু গেলেন কোথায়?" ডাক্তারবাবু হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। "লোকটা কি উবে গেল?"

"সেইসঙ্গে তুলসীর সাইকেলটারও তো পাত্তা নেই।"

"তা হলে তো খোঁজ করে দেখতে হয়!" ডাক্তারবাবুকে উদ্বিগ্ন দেখাল। "আমি বরং একটা চক্কর দিয়ে আসি।"

পুরুষ বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পাঁচজনের মধ্যে চলেছে। প্রথম ছেলেটি সাইকেল থেকে নেমে দৌড় শুরু করার দু' মিনিটের মধ্যে আরও তিনটি ছেলে নামল। ওদের পাশ দিয়ে তুলসীর সাইকেল বেরিয়ে গেল। সরোবরের একদিক থেকে বিপরীত দিকের রাস্তায় চলাচল দেখা যায়। তুলসী লোকেশ্বর বাবার মন্দিরের কাছ থেকে সরোবরের অপর দিকে তাকিয়ে দেখল, কয়েকটা সাইকেল চলেছে। মসজিদের সামনের সাইকেল আরোহীটিকে তার মনে হল, তেইশ নম্বর হলেও হতে পারে।

অনেক দূর। ওকে ধরতে হলে তাকে অনেক পথের ব্যবধান ঘোচাতে হবে। এটাই ওর শেষ পাক। সাইকেলের ফিনিশিং পয়েন্টে নেমে ও দৌড় শুরু করে দেওয়ার অনেক পরে আমি নামব, তারপর—তুলসী মনে-মনে চমকে উঠল। তারপর কী? সূর্য সঙ্ঘের দশ কিলোমিটার রেসের সেই দৃশ্যটা পলকের জন্য চোখে ভেসে উঠল—মেয়েটি হুমড়ি খেয়ে রেল লাইনের আপ তিন নম্বর ট্র্যাকের পাশে, জমিতে দু' হাত রেখে ওঠার চেষ্টা করছে।

ভাগ্য! সেদিন তাকে সাহায্য করেছিল। আজও ভাগ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে তার হাতে তুলে দিয়েছে সাইকেলটা। কিন্তু বারবার তিনবার ভাগ্য কারও পাশে এসে দাঁড়ায় না। এবার আমাকে নিজেই জিততে হবে, নিজে, নিজে, নিজে....। জিততে হবে এই লোকটির জন্য। "বাহাত্তর বছর যদি ফিনিশ করতে পারে.... আমার কথা অবিশ্বাস করছ কেন? আমি তো বাহাত্তরের অনেক কম।" আমাকে জিততে হবে। একটা মানুষ নিজের গড়া স্বপ্ন নিজের হাতেই ভাঙলেন... আর আমি অবিশ্বাস করছি না মেসোমশাই! ওহ্‌হও তুলসী, আরও জোরে, আরও জোরে।

সাইক্লিংয়ের সমাপ্তিসীমার দু'ধারে ভিড়। দু'-তিনজন হাত তুলে তুলসীকে থামবার সঙ্কেত দিচ্ছে। ছুটে এল ভলান্টিয়াররা। সাইকেল থেকে নেমেই সেটি তাদের হাতে প্রায় ছুড়ে দিয়ে তুলসী দৌড়তে শুরু করল। তার মাত্র পঁচাত্তর মিটার দূরে তেইশ নম্বর দৌড়ে যাচ্ছে। এবার দশ কিলোমিটার দৌড়তে হবে। এটা আমার নিজের ইভেন্ট!

ডাক্তারবাবু হাঁটতে-হাঁটতে দু'ধারে তাকাচ্ছেন। কোথায় বলরাম! রাস্তা থেকে সরোবরের পাড় পর্যন্ত ঘাসের জমিতে প্রচুর লোক। সবাই স্নান করতে এসেছে। বলরাম এমনই এক চেহারার, চট করে খুঁজে বের করাই মুশকিল! তবে হাঁটু পর্যন্ত গেঞ্জি আর মাথায় তিপ্পান্ন সংখ্যা দেওয়া কাপড়ের টুপিটা তাঁকে খোঁজ দিতে সাহায্য করতে পারে।

দাঁড়িয়ে পড়লেন ডাক্তারবাবু। বহু লোক ঘাসে বসে রয়েছে, কেউ-কেউ শুয়ে। একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছ, নীচে বিশাল ছায়া। তিনি দেখলেন ছায়াতে একটা সাইকেল পড়ে রয়েছে। গুটি-গুটি এগিয়ে গিয়ে চমকে উঠলেন। বলরাম চিৎ হয়ে শুয়ে, চোখ দুটি বোজা। তাঁর পাশে দু' খণ্ড হওয়া একটা সাইকেল।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করলেন, ব্যাপারটা কী? কিছুই বুঝতে না পেরে ডাকলেন, "বলরামবাবু, ও বলরামবাবু!"

চোখ খুললেন বলরাম, ভ্রূ কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড লোকটিকে চেনার চেষ্টা করে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। লজ্জিতভাবে বললেন, "একটু ঘুমের মতো এসে গেছল। জলের ওপর দিয়ে কী সুন্দর হাওয়া আর মিষ্টি রোদ....।"

"কিন্তু এখন তো আপনার হাওয়া খাওয়ার কথা নয়, ঘামার কথা।"

"এই দেখুন।" বলরাম ভাঙা সাইকেলটা দেখালেন।"

"এটা তো তুলসীর।"

"হ্যাঁ, ভেঙে গেছে, তাই আমারটা দিলাম।" বলরাম খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার জানাবার মতো স্বরে কথাটা বললেন।

"দিয়ে দিলেন!"

বলরাম অবাক হয়ে তাকালেন। "দেব না? আমার মাথায়

[illegible] কাপড়ের সেগুলো সব সাদা হত। আমিই তো [illegible]।"

"কিন্তু জিনিস করলে দেখে আপনিই প্রথম দল থেকে বাদ। ইংলণ্ডনিবাসী [illegible] দেখেন, একটি [illegible] হয়ে পড়বেন।" ডাক্তারবাবু কুঞ্চিতস্বরে বললেন। "আমি ওর [illegible] করে এসেছি যার কুল থেকে। আমাদের দেশে সাধারণ [illegible] বুড়ো বয়সে বাতিল করে [illegible] হয়, এটি যে কত [illegible] সেটাই আজ সকলে আমাকে দেখল বলে এসেছি।"

[illegible] কথাটা [illegible]-[illegible] দূরে [illegible] দিকে [illegible] দিলেন। একটি মেয়ে [illegible] এসেছে। একটি মেয়ে [illegible] দেখতে [illegible]। [illegible] চোখ [illegible] করে [illegible] কাঁদলেন, "[illegible] তুলসী।"

দুটি মেয়ে পাশাপাশি হয়েছে। প্রথমজন পাশে [illegible] দেখছেন বেশ [illegible] চেষ্টা করছে। [illegible] হেসে মাথা [illegible]। "পারবে না। বৃথা চেষ্টা।" তারপরে [illegible] দিকে তাকিয়ে [illegible] বলেন, "মেয়েদের [illegible] হয়ে গেল। [illegible], এবারে [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ছাড়া, [illegible] একটু ঘুমিয়ে নিন। [illegible] জিনিস [illegible] পারেন না।"

ডাক্তারবাবুও দূরে [illegible] দৌড় দেখছিলেন। বললেন, "[illegible] মেয়েটি কে, তুলসী? [illegible] দিয়ে বলে [illegible]।"

কথাটা কানে না নিয়ে [illegible] বললেন, "এটা [illegible]।"

দুজনে তাকালেন [illegible] দিকে।

"কাপিটিশন থেকে [illegible] বেরিয়ে গেল। আমি [illegible]। [illegible] হচ্ছে। ডাক্তারবাবু, আমার মনে হয় এটাই [illegible] বই, আমি [illegible] করেছি [illegible], তুলসী আমাকে [illegible] দিয়ে [illegible] চেষ্টা করছে। [illegible] থেকে এই [illegible] কী।" বলতে-বলতে [illegible] মুখ [illegible] দিকে তাকালেন।

তুলসী ছুটে আসছে। তার অন্তত পঞ্চাশ মিটার পেছনে তেইশ নম্বর। তুলসী [illegible] দুটি [illegible] পেরিয়ে গেল না, [illegible] দিয়ে একটু [illegible] [illegible] এক [illegible] চোখ [illegible] অনুভব করে [illegible]।

"[illegible] করতে [illegible] পারে।" [illegible] অস্ফুটে বললেন।

"[illegible], তার আমার [illegible] দরকার নেই, আমি এবার [illegible]।" ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন, "একটা সিরিয়াস [illegible] দেখেও [illegible] এসেছি।"

ডাক্তারবাবু চলে [illegible]। [illegible] তাঁকে ডাকলেন, "[illegible] পীড়ি [illegible] না, আমিও [illegible] না। [illegible]—" [illegible] মুখ [illegible] ভরে উঠল। তারপর [illegible] করে [illegible] উপর দিকেকে [illegible] দিয়ে তিনি চোখ বুজলেন।

[illegible] ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

"[illegible], [illegible]। উঠুন, উঠুন, আমি তুলসী। এই [illegible]।"

[illegible] চোখ খুললেন। তাঁর পাশে [illegible] বসে রয়েছে তুলসী, পাশে সাইকেল হাতে ধরে দাঁড়িয়ে [illegible]।

"[illegible] যে খুঁজছি আপনাকে। সারা সরোবরটা খুঁজতে [illegible] দিয়েছি। [illegible] তুলসী, প্রণাম করুন।"

[illegible] উঠে বসলেন। তাঁর দুই পায়ের পায়ের [illegible] তুলসীর [illegible] নেমে এল। [illegible] হাত নেমে এল তার মাথায়।

"[illegible] কোথায়?"

"উনি তাঁর [illegible] গাড়িতে গেলেন।"

"কিছু বললেন?"

"[illegible], তাঁদের [illegible] চিন্তা [illegible] না, [illegible]। [illegible], [illegible] কিছু [illegible] পারিনে [illegible] হয়ে পড়ে [illegible]।" [illegible] চোখে অহঙ্কার [illegible] তুলসী বলল। "[illegible] নম্বরকে আমি পাকা [illegible] রেখে [illegible] করেছি।"

"[illegible] হলে না কেন? তা হলে [illegible] উঠব।" [illegible] উঠে দাঁড়ালেন।

"[illegible] হব কেন? আমি [illegible] তুলসী [illegible]?"

"তা হলে তুলসী [illegible], এখন এই [illegible] সাইকেল নিয়ে কী [illegible]?"

"[illegible] করে [illegible] স্টেশন, [illegible] থেকে ট্রেনে [illegible] [illegible] [illegible] দোকানে [illegible] [illegible] [illegible]।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG